KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection: KLMLG	Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ১২/- ১৬/- ১৯/- ২০/- 20/-	Year of Publication: ভাদ্র ১৩৭১ ॥ Sep 1964 জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ ॥ June 1968 কার্তিক ১৩৭৮ ॥ Nov 1971 আষাঢ় ১৩৭৯ ॥ July 1972 অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ ॥ Dec 1972
	Condition: Brittle Good ✓
Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

বিংশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৭৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

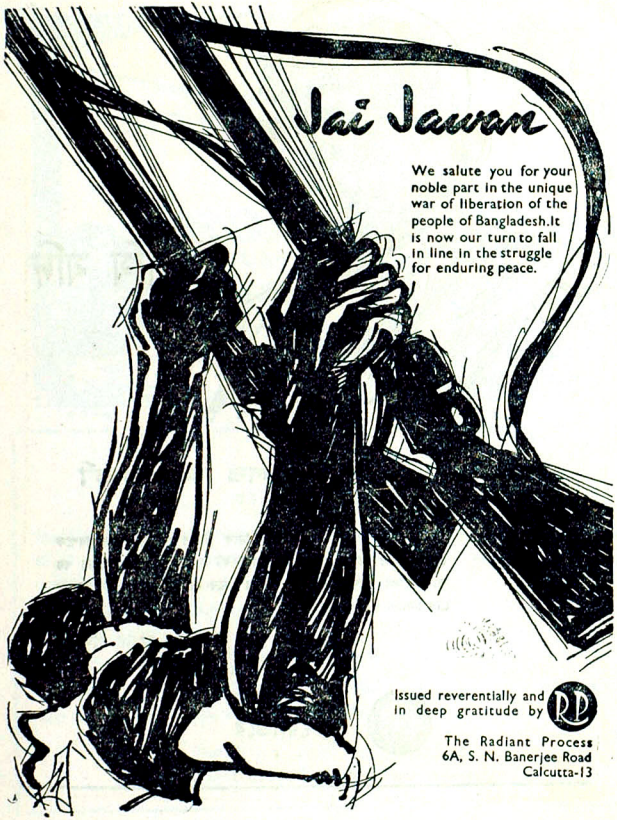

বিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা স আষাঢ় তেরশ' উনআশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

বাংলার লোকশিল্প : সংগ্রহশালা কর্মীর দৃষ্টিতে ॥ সন্তোষকুমার বসু ১২৯

মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যসুন্দর দাস ॥ কুমারশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ১৪৫

বাংলার লোকমানসে গাছপালা, জীবজন্তু ও সংখ্যা ॥ সমীরকুমার ঘোষ ১৫১

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ১৬২

সমালোচনা : উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত ॥ দীপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৬

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আসুন বিষ্ণুপুরে পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের দেশে

মল্লরাজা বীর হম্বীরের আমলে ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তার অপরূপ পোড়া-মাটির অলংকরণ বহন করছে বাংলার স্থাপত্যের সুমহান ঐতিহ্য।

রেল কিংবা সড়ক পথে বিষ্ণুপুরে যাওয়া যায়। জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনোরম বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজে উঠুন।

বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন : ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 200R

আষাঢ়
তেরশ' উনআশী

সমকালীন

বিংশ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

বাংলার লোকশিল্প : সংগ্রহশালা কর্মীর দৃষ্টিতে

সন্তোষকুমার বসু

বর্তমানে লোকশিল্প সম্পর্কে একটা আগ্রহ সৃষ্ট হয়েছে। এর কারণ একাধিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবাদর্শে গ্রামীণ শিল্পকলাকে ইংরাজ আমল থেকেই একটা বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই ব্যাপারে কোন সুসংবদ্ধ নীতি না থাকলেও স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় শিল্পকলার প্রতি একটা বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল দেশের কর্মীদের নানান স্তরে। বাংলাদেশে হিন্দুমেলার যুগ থেকেই দেশীয় পণ্যের মেলা করে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। এই ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও বিশেষ করে তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের গণচেতনায় একটা আবেদন রেখেছে ও পরে দানা বেঁধে ওঠবার বিশেষ সুযোগ না পেলেও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মধ্যে স্তিমিত এবং প্রচ্ছন্ন ছিল। তবে লোকশিল্পের বিশিষ্ট ভাব ও সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন প্রয়াস ইতিহাসের দিক থেকে রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র ও নন্দলালের কর্ম উদ্যমকে আশ্রয় করে দানা বেঁধেছে আমাদের মানসিকতায়। বিদগ্ধ ও সরস আলোচনা দ্বারা দীনেশচন্দ্র এই মানসিকতায় প্রসারতা এনেছেন একটা ব্যাপক ও লোকজীবন সম্পৃক্ত সাহিত্যালোচনার মাধ্যমে। অন্যদিকে বিশাল দিগন্তলীন ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের আধার হরপ্রসাদ প্রমুখের কোন কোন আলোচনায় লোকজীবন ও লোকায়ত শিল্প বিকাশের দৃষ্টিকোণে অনেক সম্ভাবনাময় আলোকসম্পাত দেখা গেছে।

বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারসহ সাম্রাজ্যিক সংহতি ঘটানোর অতি প্রকট ও অনধিক প্রচারিত সমীক্ষার প্রয়োজনেও এদেশের কারুশিল্প ও কারুশিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত লোকশিল্পধারার একটা বস্তুগত আলোচনার প্রবর্তন হয়েছে। এই ধারার পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ ইংরাজ ও কোনও না কোন ভাবে সাম্রাজ্যসংশ্লিষ্ট ও বাণিজ্যিক প্রশাসক। এঁরা স্বভাবতঃই বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরতর

আলোচনায় নিবিষ্ট ছিলেন। কারণ ভারতীয় লোকায়ত সৌন্দর্যকল্পনার এই সহস্রাধিক বর্ষের কালাতিক্রমকারী এই মাধ্যমটি পাশ্চাত্য স্বীকৃত। পরে এর সঙ্গে এসেছে ধাতব শিল্পের নানাদিকের ও বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের আলোচনা। কাঠের কাজ, হাতীর দাঁতের কারুকৃতি প্রভৃতি বিশেষিত এ আলোচনা ক্রমেই অগ্রসর হয়ে নানান প্রতিবেদনে সংরক্ষিত হয়েছে। এর সঙ্গে উনবিংশ শতকের দেশজ শিল্পের অনেক সমীক্ষাকে প্রথমতঃ ১৮৫১-র লণ্ডন শহরের প্রদর্শনী ও সর্বশেষে দিল্লী দরবারের প্রদর্শনীর তালিকা প্রণয়নে একটা কাঠামোয় ধরা গেছে। আমাদের দেশের দেশজ শিল্পের এ পর্যায় পর্যালোচনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভারতীয় সংগ্রহশালার বিকাশের একটা বিশিষ্ট অধ্যায়। এই দিক থেকে লোকশিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসমুখ ও তার সামাজিক কার্যকারণ, কারুকৃতি ও অলঙ্করণের আধার ও আশ্রয়ে শিল্পমননের আকৃতি ও জনজীবনের প্রাণচাঞ্চল্য ধরা পড়েনি এবং সেটি ধরে রাখার প্রচেষ্টাও অনুপস্থিত ; অন্ততঃ বর্তমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণে। এর পরিবর্তে এ ধারার বিবরণে কাঁচামাল, শিল্পী উৎপাদনের কর্মকৌশল, শিল্পীদের কর্মপদ্ধতি ও অন্তিম মধ্যযুগের নগরকেন্দ্রিক কারুকৃতিই অধিকতর স্থান দখল করে নিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব বিংশশতকের প্রথম চতুর্থাংশ থেকে এই বিভাগে বাউডড, ত্রৈলোক্যনাথ, ওয়াট ও ব্রাউন প্রমুখ বর্ণনাকারীরা ভারতীয় কারুশিল্পের যে আলোচনার প্রবর্তন করেছেন তার বহু অংশই নিষ্ঠা ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের দিক থেকে আজও অনুসরণ করার মত। এই সময়ে করা অনেক রেখাঙ্কণের মুদ্রণ পারিপাট্য ও বিস্তৃত প্রতিরূপায়ণ শিল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে আলোকচিত্রের উপস্থাপনকেও এক সফল প্রতিযোগীতায় আহ্বান করতে সমর্থ।

লোকশিল্পকে কেবলমাত্র 'সুন্দর' বলে নিশ্চেষ্ট না থেকে সংগ্রহ করার যে ধারা এখন গড়ে উঠেছে তার পথপ্রদর্শক গুরুসদয়। পরে লোকশিল্পের সৌন্দর্য ও বিশিষ্ট প্রকাশ নিয়ে স্বদেশীয় অনেক আলোচনা গড়ে উঠেছে অবনীন্দ্র প্রমুখের নেতৃত্বে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার নিবন্ধমালায়। বিংশ শতকের তৃতীয় দর্শকের শেষদিকে, চতুর্থ দশক ও পঞ্চমের বেশ কয়েক বর্ষ এভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পর্যায়ের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ পরিচালিত হয়েছে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁর সহকর্মী তাঁর ছাত্রদের ও অধস্তনদের দ্বারা। এছাড়াও তাঁর সংস্পর্শে আসা উৎসাহী সংগ্রহালয় কর্মী প্রভৃতিরাও নানাভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

লোকশিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব—এর মধ্যে লোকশিল্পায়নের বিচার বিশ্লেষণ একটা ইতিহাসাশ্রয়ী ও প্রাচীন প্রত্ন-নিদর্শন অবলম্বনকারী আলোচনাও একটা বিশেষধারা রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। যেমন উনবিংশ শতকের মধ্যকালে ও তার পরের ক্রমশঃ আবিষ্কৃত অনেক প্রত্ন সৌধ, ভাস্কর্য নিদর্শন ও প্রাচীন কারুকৃতির দ্বারা সৃষ্ট জিনিষ প্রভৃতিতে এমন অনেক রীতি বা রূপায়ণ দেখা গেছে যাকে লোকায়ত অর্থে ও লৌকিক ধারায় বিচার করলে তবেই তার অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে। ভারতের স্তম্ভ-প্রাচীরে উৎকীর্ণ জাতককথা, মথুরার পোড়ামাটির কাজ ও শুঙ্গ যুগের মৃৎফলা যে সমস্ত নাগকুল, বৃক্ষদেবতা, মাতৃদেবতা ও পশুকুলের এবং যক্ষের পাথরের স্থানক মূর্তি মৃত্তিকা বা মৃৎফলক সংগ্রহশালায় এনে দিয়েছে তার একমাত্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সেই সময়কার চিরায়ত লোকমানসের নিদর্শন রূপেই স্বীকৃত হয়েছে ক্রমান্বয়ে। এ ধারা ক্রমশঃ আপন প্রসারতাকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে। হরপ্পীয় যুগের মৃৎফলক ও অতুলনীয় মুদ্রাঙ্ক আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়ে বুঝিয়ে

দিতে সাহায্য করেছে যে আমাদের আদিম ভাবনায় লোকায়ত প্রয়োজন ও মূল্যবোধ কত অকৃত্রিম। মৃৎপাত্র অলঙ্করণের সম্পর্কেও এই কথাই বলা চলে। এর পরে দেখা গেছে প্রাচীন বিনিময়যোগ্য মুদ্রার বিশিষ্ট সব প্রতীকের সমারোহ। প্রতিমার রূপকল্পনা ও ধর্মীয় মূর্তি-তত্ত্ব—জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, যাই হোক না কেন আমাদের ক্রমশঃ বুঝিয়ে দিয়েছে যে যে দেবতার প্রভা মণ্ডল তার অলঙ্কার ও আয়ুধ এবং পার্শ্ব দেবতাদের উপস্থিতি ও মূল বিগ্রহের বহুলাংশ পূর্ণায়ত বিচারে লোকায়ত ধারা থেকেই উদ্ভূত। এ বিষয়ে কাজ করেছেন ভারতীয় প্রত্নবিদ্যার সমগ্র আলোচনা ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকপালেরা। পরিশীলিত চারুশিল্প অথবা আদিম ভাবাপন্ন মহাপ্রস্তরীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট অথবা মধ্য ভারত ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের গুহা চিত্রণও এককথায় সারমর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। গত পঁচিশ বৎসরে যে সমস্ত প্রত্নস্থল পর্যালোচিত হয়েছে, বিশেষ করে অধ্যাপক সাঙ্কালিয়া কর্তৃক নেভাসা-নাওদাটোলি প্রভৃতি প্রত্নকেন্দ্রের যে প্রাগৈতিহাসিক প্রথম ও ইতিহাসকালীন সাংস্কৃতিক বিবরণ রচিত হয়েছে তার মধ্যেও দেখা যায় যে প্রাচীন লোকজীবনকে বা শিল্পকলাকে বাদ দিয়ে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাচীনকালীন অনেক নিদর্শনবিশিষ্ট কি সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত সেটা আধুনিক লোকশিল্প বা ব্রতাদির সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না থাকলে অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। এই সময়ে প্রত্নক্ষেত্র বীক্ষণ ও উৎখননের অন্যান্য পর্যায়ে লোকাচার লোকশিল্পাকার নিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন কারণ পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে নানা ধরণের আঞ্চলিক ও সামাজিক ব্যবস্থা আজও পাশাপাশি বেঁচে আছে।

লোকশিল্প ও নৃতত্ত্ব : নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের ধারা সমীক্ষণ করে। পূর্বতন সময়ের মানব বিকাশের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক রূপ ও মানব জীবনের প্রাকৃতিক অনুসঙ্গও এই বিভাগের কাজ। অন্যদিকে তথনকার পৃথিবীতে ছড়ান আদিম মানব গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিকাশ, সংযোগ ও বিনাশের কার্য কারণ অনুসন্ধানের কাজও এই বিষয়টির অনেকখানি স্থান নিয়ে আছে। নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির পর্যালোচনা উপকরণ ভিত্তিক বা উপকরণ আশ্রয়ী। কাজেই বিশিষ্টভাবে নৃতত্ত্বের সংগ্রহে ও সংগ্রহশালায় আদিম গোষ্ঠীদের উপকরণ ও শিল্পকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সর্বসাধারণের যে স্তর থেকে লোকশিল্প উৎসারিত তার সামাজিক অবস্থান আদিম গোষ্ঠীদের সঙ্গে এক গভীর বিষয়ভিত্তিক ও আঙ্গিকরূপ প্রকাশে মিশ্রিত। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে তাই লোকশিল্পের আলোচনা আদিমগোষ্ঠী বা উপজাতীয় শিল্পসৃষ্টির সংগ্রহ বা আলোচনা থেকে পৃথক বা নির্বাসিত হয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে আলোচনা ও নিবন্ধে 'লোকশিল্প' যেন শিল্প-ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্বের তত্ত্বাবধানকারীদের করতলগত। আবার উপজাতীয় শিল্প ও শিল্পতত্ত্বের আগারিকের কাজটি গ্রহণ করেছেন নৃতত্ত্বের সংগ্রাহক-আলোচকগণ। এ অবস্থায় নৃবিদ্যার পূর্বতন, আদিম এবং সমসাময়িককালের বিশাল প্রাঙ্গণে কাজ করার উপযোগিতা অন্ততঃ আংশিকভাবে অস্বীকৃত থেকেছে। অন্যদিকে সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত ইতিহাসের ছাত্র লোকশিল্পের নিখুঁত বর্ণনা ও নথিকরণের কাজটি উপেক্ষা করেছেন। অথচ ভারতের ইতিকথায়, পুরাণে, শিল্পে ও লোকাচারে প্রাকৃতজন ও আদিম জাতিদের নিগূঢ় অবদান নানান রূপে এমনকি ভারতের সবচাইতে পরোক্ষ রূপায়ণের মধ্যেও ধরা আছে। যথার্থ ভারতীয় আদিম জাতিদের ভারতীয় সমাজে উত্তরণ

যুগে যুগে বিভিন্ন পদ্ধতি চলে আসছে ও ভবিষ্যতে ভারত লোকসংস্কৃতিতে তার বিশিষ্ট ধারা ও গৌরবময় রূপ দেখেও দেবে সুতরাং এই ভাবনাকে অস্বীকার করার কারণ নেই।

লোকশিল্প, উন্নয়নকামী সমীক্ষা ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ—লোকশিল্পের বর্তমান সমীক্ষায় লোকগণনা সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ও উন্নয়নকামী অর্থনীতি এক বিশেষ প্রকারে আলোচনায় উৎসাহ যুগিয়েছে। এখানে সাধারণতঃ লোকশিল্পকে দেখা হয়েছে হাতে তৈরী কারুকর্মরূপে। অতএব এর একটা নতুন নাম দেওয়া হয়েছে হস্তশিল্প। এ বিষয়টির মধ্যে বিভিন্ন কারুকৃতির শিল্পকাজকে ধরা হয়েছে হাতে তৈরী করা সম্ভব বিক্রয়যোগ্য পণ্য রূপে। এর একটা গূঢ় দিক আছে। মূলতঃ অনেক শিল্পকে দেখুন সামাজিক ব্যবহারে গৃহীত ও আত্মিক উপাদানরূপে। লোকশিল্পের সংগ্রহশালার কর্মীরা লোকায়তশিল্পকে দেখেন সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যগত বিবর্তনের নিদর্শনরূপে। কিন্তু হস্তশিল্পের উৎসাহীকর্মীরা শিল্পনিদর্শনকে পর্যালোচনা করেন তার কাঁচামাল বা উপাদানের প্রকৃতি ও তার বাজারের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে। কোথাথেকে মূল উপাদান সংগৃহীত বা আহরিত হচ্ছে বা কিভাবে সেটি প্রাথমিক ও পরবর্তীধাপে রূপান্তরিত ও সরাসরি ব্যবহার উপযোগী কার্যকর উপাদানে পরিণত করা হচ্ছে সে সমস্ত সংবাদ তাই এই পর্যায়ের সমীক্ষণের আগ্রহ সৃষ্টি করে। প্রয়োগ পদ্ধতি ও বিপণন প্রক্রিয়া লাভ-লোকসানের নির্দিষ্ট পরিমাপের একই কারণে দেশের সমগ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার কাজ রূপে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এর লাভ এই যে আমরা যদি উপাদান ও প্রয়োগ পদ্ধতির কারুকৌশলগত ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগত কার্যকারণ না খুঁজে উঠতে পারি তাহলে লোকশিল্পের অনেকটা দিকই আমাদের কাছে অপরিচিত থেকে যাবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'হস্তশিল্প' সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে লোকশিল্পের সৌন্দর্যবোধে উদাসীন উন্নয়নকামীদের অধিকারগত আবেগানুসারে বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। তবে এ বিভাগের উৎসাহী কর্মীরা ও গবেষকরা যে প্রতিবেদন ও প্রকাশনা করেন সেসমস্ত অনেক পূর্ণাঙ্গভাবে আশানুরূপ না হলেও উপরিলিখিত প্রকারের সংবাদের আকরগ্রন্থরূপে গৃহীত হবার যোগ্য। এঁদের তৈরী করা কেন্দ্রীয় নথিবদ্ধকরণ পদ্ধতি ও সরেজমিনে সমীক্ষার প্রয়োগ সম্পর্কিত কাজেও কার্যকরী হবার সম্ভাবনা কিছুটা আছে বলেই মনে মনে হয়।

এখন এল শুধু উন্নয়নের কথা। লোকশিল্পীকে তুলে ধরতে হবে জনসাধারণের স্বীকৃতিতে ও বৈষয়িক আশ্বাসনে লোকশিল্প ছড়িয়ে দেবার কাজটি করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক অপরিচিত রূপ সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নের কাজ চলেছে উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে। উন্নয়ন কেন্দ্র হয়ত সৃষ্টি করেছেন স্বাভাবিক ভাবে এমন সমস্ত রূপকল্পনার বা শৈলীর যেটা আমাদের কারুকৃতির খোল-নলচে পাল্টে একটা বিকৃত চেহারার প্রবর্তন করে চলেছে। এটা এত ব্যাপক যে যে কোন সাধারণ পুতুল খেলার ব্যক্তিক আছে বা বেশী পট সংগ্রহ করার আগ্রহ বর্তমান এমন সাধারণ মানুষেরও সহজেই চোখে পড়ার মত। এর কারণ একাধিক। আধুনিক ধারা শিল্পবিদ্যালয়, চলতি উপাদান প্রস্তুতকারক ও চলতি রং ও অনুলেপন পদ্ধতি, বর্তমানে কল-কারখানার কর্মপ্রণালী ও বিজ্ঞাপন প্রভাবিত রূপকল্পনা সবই এতে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কাজ করে চলেছে। এই বিষয়ের কোন ধারাবাহিক অথবা বিশেষিত অনুসন্ধান এখনও হয়নি। কিন্তু কিভাবে এরকম একটা অবস্থার

সৃষ্টি হল সেটা নিশ্চিতভাবেই একটা গভীর গবেষণার কাজ তৈরী করে দিতে পারে লোকশিল্পের আগ্রহীদের জন্য।

লোকশিল্প ও লোকসাহিত্য—লোকশিল্প ও লোকসাহিত্য বর্তমানে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি করে। প্রাথমিক পরিবেশে মানবসমাজ জীবনধারণের কাজে প্রয়োজনে যে ক্রিয়াকলাপ তৈরী করেছিল বা করে চলেছে তার থেকে গড়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি দ্বিবিধ ঘটনাযোগে ও সংযোজনে রূপে লোককথার মৌখিক রূপটিতে প্রকাশিত হয়ে সঞ্চারিত হয়েছে হেঁয়ালিতে ছড়ায়, গানে ও এ সমস্তের সংযোগে গড়ে ওঠা সাহিত্য-সঙ্গীতে এবং অভিনয়ে। লিখিত প্রকরণ এসেছে পরবর্তীকালে, লোকসাহিত্যের আলোচনা এসেছে সর্বশেষে। দেখা গেছে যে লোকসাহিত্যের অধ্যয়ন এবং সর্বজনগ্রাহী ও উচ্চ ভূমিকাকে নির্ভর করেই মূলতঃ ও নানা রূপান্তরী রচিত সাহিত্যের উদ্ভব। অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক এখনকার মত। অতুলনীয় বাংলার রূপকথা নিয়ে একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে এর একমাত্র বা প্রধানতম চিত্রায়িত রূপ ফুটানো পটের মধ্যে দেখা যায়। অনুরূপভাবে কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা, রামায়ণ কাহিনী বাংলার পটে কাঁথা, উল্কি, মন্দিরের পোড়ামাটি ফলক, পুঁথির পাটা সবকিছুকে আবৃত করে চোখে দেখার যোগ্য শিল্পকাজের মাধ্যমে মনে দেখার সাহিত্যকে অপরূপ ভাবধারায় বহন করেছে। এবার ছড়ার কথা বা প্রবাদের কথা ধরা যাক। ছড়া যদি ধরতে হয় তবে কাঠ-মাটি, সোলা দিয়ে গড়া হাতে-গিঁটের পুতুল, তাঁতে বোনা দিয়ে বা পুতুল, পুতুলে, সবকরার হাত কাটে, বৌকা পাখীতে চলা মানুষ, পশুপাখী প্রভৃতি অজস্র পুতুল খুঁজে না দেখলে চলবে না। কারণ মৃত্তিকা বা পুত্তলিকার সর্বনীকরণ অথবা বিশেষ আকারকে বিশেষিত অঙ্গের অভিব্যক্তি দেখার রূপ না দেখলে ছড়া ও প্রবাদ কথার অনেকটাই বোঝবার বাইরে থেকে যায়। গান গাইবার সঙ্গে জড়ানো ব্রতের ও আচার-অনুষ্ঠানের ধারণার ভিতর প্রাথমিক প্রাণিক ভঙ্গিমার রূপকল্পনা ও প্রকাশভঙ্গী সর্বক্ষেত্রে রূপরেখা, লেখচিত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে আছে। মঙ্গল বা আদিম দর্শনের তত্ত্বকথা বা সাধন সম্পর্কে পণ্ডিতী ও শুকনো বাক্যকথনে যদি পুতুল অথবা থেকে আসা মঙ্গলঘটের আলপনা দেখার ও তাদের বিবরণ না থাকে অথবা শনিবারের এক ঘড়া জলভরা ঘটের গড়-ঘুর সম্বলিত বা মনসা বাহন, বাহক ও পূজারীদের আত্মস্ফূর্ত আকস্মিক বিশিষ্টতায় রূপভাবনাকে স্বীকার না করা হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই একটা জোলো ও নির্জীব প্রাণহীন সাহিত্য আমাদের অজান্তে সৃষ্টি করবে এবং এখন করছে। পটের শিল্প, শাঁখার শিল্প, হাতের শিল্প ও কাজের শিল্প বাংলার কৃষি-সমাজের এক নিত্য আত্মরূপ দর্শনের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ মাত্র। এখানে অনেক কাজ করবার আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুচারজন বেশী বিদেশী এই গবেষণা, ঐতিহাসিক বা লোকশিল্প সংগ্রাহক শিল্প ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকৃতি নিয়ে একইভাবে ব্যস্ত। তাঁরা সাহিত্য বা সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষেত্রের দিক সম্পর্কে খানিকটা উদাসীন। কাজেই সাহিত্যের ছাত্ররা বেশ খানিকটা কাজ করে লোকশিল্পের নূতন একটা দিক খুলে দিতে পারেন। সাহিত্যের ছাত্র লোকশিল্পের কোন একটা নিদর্শন নিয়ে সেই জিনিসটির বা সমষ্টি জিনিসের অথবা শিল্পরূপের সঙ্গে যে লোককথা ছড়া ও গান, অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি জড়িত ছিল পূর্বযুগে অথবা বর্তমানে সেটা

যদি উদ্ধার করেন ও সাধারণভাবে ছড়িয়ে দেন তাহলে লোকশিল্পের সাহিত্য প্রবাহলীন লোকায়ত ভাবনার দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

লোকশিল্প ও লোকভাষা—লোকশিল্প ভাষাবিদ্ বা শব্দতাত্ত্বিকদের নিকটও একভাবে আলোচনার যোগ্য। লোকায়ত শিল্পের ব্যবহৃত বিশেষ পরিভাষায় এমনসব শব্দ ব্যবহৃত হয় যা যথার্থভাবে দেশজ ও অকৃত্রিম। আঞ্চলিক শব্দ সমাজের সবচাইতে প্রসারিত অঙ্গনের কথিত ভাষায় ব্যবহার করা হয়। অতএব এই শব্দের গঠনতাত্ত্বিক ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উৎস সন্ধান আমাদের ঐ সমাজের স্থানীয় ও জাতীয় আধারে মূল্যায়ণে সাহায্য করতে সমর্থ। অনেক সময়ে দেখা যায় শব্দের প্রচলন ও ব্যাপকতা লোকশিল্পীদের মাধ্যমে এই মহাদেশের বহুঅংশে প্রায় অবিকৃত রূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এটি সাধারণভাবে একটি অনাবিকৃত- জগৎ যেটা আমাদের ইচ্ছাকৃত ও কাম্য অনেক মতবাদের অবসান ঘটাতে পারার ক্ষমতা রাখে। সংস্কৃতি-সংযোগের প্রকৃতি নির্দ্ধারণেরও এর মূল্য অপরিসীম। প্রধানতঃ তিনটি জিনিষ এক্ষেত্রে দেখা যায়। মাতৃকুলের দ্বারা যে লোকশিল্প প্রচলিত সেসবের পরিভাষায় আদিম ও দেশজ ভাব সর্বাধিক এবং সবচেয়ে রক্ষণশীল। দেখা যায় যে মধ্যযুগের নগরকেন্দ্রিক বস্ত্রশিল্প ও ধাতবশিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে পশ্চিম এশীয় শব্দাবলী অধিকতর প্রচলিত। আবার গোষ্ঠীগতভাবে কৃষিকাজে নিযুক্ত সমাজে লোকদেবতার আচারে যে সমস্ত বিশেষ শব্দ লোকশিল্পে আছে সেসব গভীরভাবে ঠাঁই পেয়েছে আঞ্চলিক ভাষায় ও ভাবনায়। এই তিনটি বিষয় নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন কারণ এতে একদিকে যেমন দেশকে আরও গভীরভাবে চেনা যাবে তেমনই অন্যদিকে এই শব্দ ভাণ্ডার থেকে আমরা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন এমন বর্তমানের উপযোগী বেশকিছু পরিভাষা করে নিতে পারব। নন্দলাল বসু কৃতশিল্পচর্চা বইটি একটু উল্টিয়ে দেখলে একথা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে বলে মনে হওয়া অসঙ্গত হয়। একথা মনে রাখলে মন্দ হয় না যে শিল্প আলোচনার সীমান্তবর্তী বিষয় সমূহে এমন অনেক পরিভাষার প্রয়োজন দেখা দেয় যেটা আমরা অন্নায়াসে বিদেশীভাষা থেকে ধার করতে অভ্যস্ত দেশজ ও সরল শব্দাবলী থাকা সত্ত্বেও।

সংগ্রহশালার নিদর্শন ও প্রদর্শরূপে লোকশিল্প—লোকশিল্প, লোকায়ত শিল্প বা সমাজ ব্যবস্থার শিল্পাশ্রয়ী উপকরণ যে রকমভাবেই হোক না কেন অথবা যে দৃষ্টিতেই দেখি না কেন সংগ্রহালয়ে লোকশিল্প বীথিতে, কীর্তিশালায়, লোককৃতি আলয়ে এই সমস্ত দ্রব্য অনুসন্ধানের ও গবেষণার কিম্বা রসাস্বাদনের সামগ্রী। ঐ দ্রব্য সম্ভারকে আজ যে কোন কারণেই হোক না কেন তাদের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সরিয়ে। না এনেও উপায় নেই কোথাও তারা অবহেলিত, কোথাও বা তাদের প্রয়োজন কেবলমাত্র স্পল্পদিনের এবং বেশীর ভাগ অবস্থায় সাধারণ অস্বীকৃতিই তাদের ভবিতব্য। এখানে উঠছে লোকশিল্প কি প্রদর্শ না নিদর্শন এই প্রাথমিক প্রশ্ন নিয়ে ধারণার কথা। সংগ্রহশালার কর্মীদের এর জবাব দিতে হয়। লোকশিল্পের নিদর্শন ঠিক নিসর্গ বিজ্ঞানের নিদর্শনের মত নয়। অর্থাৎ লোকশিল্প সম্ভারকে একই প্রথায় বা পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণী জাতি বা প্রজাতিকে বিভক্ত করার কাজটিকে শেষ করে দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে নিশ্চিত কোটরে নিক্ষিপ্ত করা চলে না। কারণ লোকশিল্পের প্রত্যেক নিদর্শনের একটি একক ও বিশেষ মূল্য আছে যেটি

পরিবর্তন সাপেক্ষ। ঠিক এই অবস্থার বাস্তব প্রয়োজনে প্রত্যেক নিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই তালিকায় কোথা হতে আহরিত, কি ভাবে আহরিত কার দ্বারা তৈরী, তৈরী দ্রব্যের উপাদান কি, প্রয়োগ ও নির্মাণ পদ্ধতি কি, সরাসরি শিল্পকেন্দ্র থেকে সংগৃহীত অথবা কারও পূর্বেকার সংগ্রহ হতে আনিত কিনা এসব সংবাদ ও বিবরণ থাকা উচিত। এর সঙ্গে সামাজিক উপযোগিতা ও ব্যবহার ও অন্যান্য সংগ্রহালয়ে সহধর্মী নিদর্শনের নির্ঘণ্ট ইত্যাদি। কিন্তু লোকশিল্পের অধিকাংশ সংগ্রহশালায় উপযুক্ত কর্মীর অভাবে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করা হয়নি। অনেকক্ষেত্রে আবার বহুদিন আগে হয়ত সংগ্রহশালায় বহু জিনিষ এসে জমা হয়েছে কোন রকম বিশেষিত আনুষঙ্গিক বিবরণ ছাড়াই। এর পরে ক্রমে অনেকদিন ও বছর অতিক্রান্ত হবার পর কোন নিদর্শন কোনখান থেকে কার দ্বারা কি ভাবে এসেছে তার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করার আজ কোন উপায়ই থাকেনি। ভারতের লোকশিল্প বিষয়ক অধিকাংশ কেন্দ্রেই এই অবস্থা। সামান্য ব্যতিক্রম অবশ্য আছে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে (তবে সেটা আংশিকভাবে)।

এর পরে আসছে লোকশিল্পের আলোক চিত্রণের কথা। আলোকচিত্রণের সঙ্গে রেখাঙ্কণের গুরুত্বও কম নয়। প্রথমটির একটি সমাকার প্রতিরূপ মুদ্রণ যদি লোকশিল্প নিদর্শনের তালিকায় দিয়ে দেওয়া যায় তবে দর্শক ও অনুসন্ধানীদের সাহায্য করা হয় যথার্থভাবে। রেখাঙ্কণের প্রয়োজন অন্যকারণে। লোকশিল্পের বহু নিদর্শনে এমন অনেক খোদিত, অপলেপিত বা অন্যভাবে করা অলঙ্করণ আছে যে সমস্তকে একমাত্র সমান আকারের অথবা আনুপাতিক হারে ক্ষুদ্রায়িত অথবা বৃহদাকার রেখাঙ্কণের মাধ্যমে বোধগম্য করে তোলা যায়। এই রেখাঙ্কণ এক বা বহু বর্ণের হতে পারে প্রয়োজনবোধে। লোকশিল্প বিষয়ে বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়নের কাজ কিছুটা অগ্রসর হলেও অলঙ্করের রূপ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণে রেখাঙ্কণ সমন্বিত ধারাবাহিক কাজ প্রায় কিছুই হয়নি বললেই চলে।

এবারে আমরা লোকশিল্পকে শুধুমাত্র নিদর্শন বা উপকরণ বলে ধরে নিয়ে আমাদের আলোচনাটিকে সীমাবদ্ধ করে না ফেলে সংগ্রহশালার প্রদর্শন কক্ষে চলে আসব। এখানে আমরা লোকশিল্পের নিদর্শনকে দেখব প্রদর্শরূপে। প্রদর্শ বা প্রদর্শনীতে রক্ষিত দ্রব্যকে রক্ষা করা হয় দর্শকদের জন্য। এখন শুধুমাত্র নিদর্শনটিকে প্রদর্শিত করলেই কাজ শেষ হয় না। এর একাধিক কারণ বর্তমান। যে পটভূমি কোন একটি নিদর্শনকে অর্থবহ করে তোলে সংগ্রহশালায় লোকশিল্পের সেই ভূমিকা অনুপস্থিত। কাজেই অর্থবহ পটভূমি তৈয়ারীর দায়িত্ব সংগ্রহকারী প্রদর্শকের। খানিকটা কাজ এ ব্যাপারে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্ততাবে হয়ে যায় যখন একই আঙ্গিক বা মাধ্যমকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা শিল্পকে এক জায়গায় বা কাছাকাছি রাখা হয়। যেমন জড়ানো ও চৌকোপট, পুঁথির পাটা এ সবই ছবি কাজেই পরের পর সাজান থাকলে এর একটা মানে হয়। আবার মাটির মৃতিকা সেটা পোড়ামাটি বা রোদে দেওয়া কাঁচা মাটির যাতে রঙ ছাড়া বা রঙ দিয়ে যে ভাবেই করা হোক না একসঙ্গে থাকতে পারে বা রাখাতেও বিশেষ একটা অর্থ হয় তার। কাঁথার নক্সী অলঙ্করণ আর সিকা বটুয়া ও কাপড়ের লোকশিল্পধর্মী সূচের কাজও একসঙ্গে একটা বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি করে। তাঁতের টানা-পোড়েন বা বুননের বালুচর, বিষ্ণুপুরী, ঢাকাই জামদানী এসব একসাথে রাখা যায়। একটু ভেবে দেখলে আর এক রকমের ঐক্য সংগ্রহশালা কর্মীর সহজেই চোখে পড়ে। এক তৌগোলিক

অঞ্চলের বহুমুখী শিল্পকলাকে একত্রিত করলে সমগ্র সমাজমানসের একটি বিশেষ আঞ্চলিক রূপ ফুটে ওঠে। যেমন মেদিনীপুরের পুতুল, ব্রতচারে পালাপার্বণের বিভিন্ন পূজা ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের ঘট ও পট, চিত্রিত পুঁথি, পোড়ামাটির মুখফলক এসব একসঙ্গে এক পরস্পরযুক্ত প্রদর্শশ্রেণীর সৃষ্টি করবে যেটা ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি রূপায়ণের ও মৌল প্রকৃতির রূপরেখাকে ফুটিয়ে দিতে পারবে। অনুরূপ প্রদর্শনী বাঁকুড়া-বীরভূম অথবা যশোহর-খুলনা অঞ্চলকে নিয়েও পরে দেখান যেতে পারে। কিন্তু জিনিষ সংগ্রহ করে অথবা বর্গীকৃত করে আরও বহু রূপ ও রূপাদর্শ আমাদের কাছে ধীর ও নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে, বাংলার লোকশিল্পে মানব আকৃতির রূপায়ণ, বঙ্গীয় লোককলায় পশুপক্ষীর আকার ও অবস্থান, আঞ্চলিক লোকশিল্পে বিদেশীয় প্রভাব অথবা বিদেশীয় শিল্পকলায় বাংলার অবদান এই ধরণের মনন নির্ভর কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। আলাপন ও আলোচনা সংগ্রহশালার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রদর্শ সংস্থাপনে বিশৃঙ্খলা এনে দিতে পারে। কিন্তু এই সব ধারার আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেন না এর সাহায্যে লোকশিল্প গবেষণার চলিত পথ ও অস্থীভূত মতবাদ সমূহের মূলে নাড়া দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। এ অবস্থায় দেখা যায় যে স্থায়ী প্রদর্শাগারের ক্ষতি না করে যাতে সংগ্রহশালা ভবনে একধিক অস্থায়ী প্রদর্শনীকে করা যায় বিভিন্ন বিশেষ ভাবনাকে ও চিন্তাকে প্রদর্শনের সাহায্য জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। লোকশিল্প সম্পর্কে উৎসাহী ছাত্র ও অনুসন্ধানীরা এই প্রকারের অস্থায়ী প্রদর্শনীর সাহায্য নিয়ে বাস্তবানুগ ভাবে তাঁদের প্রতিপাদ্য বিশেষ বিষয়টিকে সংগ্রহশালা কর্মীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের পথ গ্রহণ করে অর্থবহ করে তুলতে পারেন।

লোকশিল্পের এমন অনেকদিক আছে যেখানে আলোকচিত্র বা অন্তরকমের পরোক্ষ অঙ্কনের সাহায্যে প্রমাণ ও ব্যবহারিক পদ্ধতিকে ধরে রাখতে হয়। আলপনার কথায় এলে দেখতে পাব যে এর ভঙ্গিমা ও প্রতীকী গভীর ও লোকশিল্পের বিভিন্ন বিভাগকে সম্বন্ধ করেছে। কিন্তু আলপনা অন্য নিদর্শনের মত যথা ইচ্ছা প্রদর্শশালায় নিয়ে আসা যায় না। কাজেই প্রধান প্রধান আলপনার চিত্র সংগ্রহশালা নথিতে রাখা দরকার। আলপনা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের অলঙ্কৃত বড়ি, মালাকারের পুষ্পসজ্জার পদ্ধতি প্রভৃতির চিত্র আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকারের ডাকের সাজ, শোলার কাজ ও অলঙ্কার প্রভৃতি সংগ্রহশালায় দীর্ঘদিন ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করা সুকঠিন কাজেই এ সমস্তকেও পরোক্ষ চিত্রের নথির মধ্যে সুবিন্যস্ত করতে হবে।

একটা সাধারণ কিন্তু সর্বস্থায়ী প্রশ্ন সংগ্রাহককে সর্বদাই ভাবিয়ে তোলে। প্রত্যেক কর্মনিষ্ঠ সংগ্রহশালা কর্মী জানেন যে সংগ্রহশালায় আগমনকারী দর্শকদের কাছে বিভিন্ন লোকশিল্পের কর্ম-কৌশল ও প্রয়োগ পদ্ধতিটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার কাজটি কত কঠিন। কলকাতার একটি সুপরিচিত সংগ্রহে খোদিত রেখার একটি তালপাতার পুঁথির নিকটে একটি ধাবত লেখন শলাকা বা লেখনী বহুদিন ধরে রক্ষিত আছে। সংগ্রহশালার প্রদর্শক বার বার পরীক্ষা করে দেখেছে যে ঐ লেখনী পুঁথিটির চিত্রায়ণের কর্মকৌশলকে সহজে বুঝিয়ে দেবার পক্ষে কত প্রয়োজনীয়। ঠিক এই ভাবনার পথে অগ্রসর হলে লোকশিল্পীদের তৈজস, যন্ত্রপাতি, শিল্পবস্তুর উপাদান ও বিভিন্ন স্তরের ও পর্যায়ক্রমের অসমাপ্ত লোকশিল্প নিদর্শন সংগ্রহের ও একটি বিশেষ প্রয়োজন অস্বীকার করার

উপায় নেই। কোন বিশেষ শিল্পকৃতির অস্থায়ী প্রদর্শনীতে অথবা স্থায়ী প্রদর্শন কক্ষের একান্তে এরকম একটি ক্ষুদ্র ও সুনির্বাচিত প্রদর্শ থাকলে সুবিধা ছাড়া অসুবিধাতো হবে না উপরন্তু নানা রকমের বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। সংগ্রহে নাচের মুখোশ আছে কিন্তু মুখোশ-নৃত্যের চিত্র নেই এরকম অবস্থা লোকশিল্পের যে কোন কেন্দ্রের পক্ষেই দুঃখজনক।

পুরাতন লোকশিল্প সংগ্রহের সমস্যা—লোকশিল্প লোকজীবনের শিল্পরসবোধের পরিচয় বহন করে। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অতীতের নিদর্শন সংগ্রহ বর্তমানে অপেক্ষাকৃত দ্রুতসঞ্চারী ক্রম বিবর্তনে তার যথার্থ অর্থকে হারিয়ে ফেলেছে অথবা সংগ্রাহক তাঁর আহরিত দ্রব্যের সমাজ ও শিল্পভিত্তিক পরিমণ্ডলকে সচেতন নথি প্রণয়নের অভাবে বিস্মৃত হয়েছেন। আমাদের দেশীয় লোকশিল্পের সংগ্রহালয় সমূহে এটি বর্তমানে একটি ভীষণাকার সমস্যা। এর উপযুক্ত প্রতিবিধান লোক ও কারুশিল্পের কিছু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক জোগাড় করে পড়ে ফেললেই শেষ হবে না কোনক্রমেই। মিউজিয়ম বা সংগ্রহালয়ে কিছু নথিবদ্ধ পুঁথি পুস্তক অথবা উৎকৃষ্ট লেখার সারাংশ রক্ষা করা উচিত। সংগ্রহের প্রত্যেকটি জিনিষের বর্গীকৃত তালিকার মধ্যে সম্ভব হলে গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ থাকলে উত্তম হয়। কিন্তু এতসব করেও পুরাতন লোকায়ত শিল্পদ্রব্যকে গবেষণার কাজে নিযুক্ত করতে গেলে মাঝে মাঝে নিয়মিতভাবে প্রবীণ লোকশিল্পীদের সংগ্রহালয়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে পুরাতন সংগ্রহের নিদর্শন তাঁদের দেখিয়ে সেই সমস্ত নিদর্শন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জেনে নেওয়া উচিত। আমরা দেখি যে বিভিন্ন সংগ্রহালয় কর্তৃপক্ষ লোকশিল্প দ্রব্য সংগ্রহের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন না। তবে তাঁদের পক্ষে মূল শিল্পীকে সংগ্রহালয়ে আমন্ত্রণ করে যথার্থ সংবাদ আহরণের খরচও দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পিছ পাও হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই রকম কর্মপদ্ধতি কদাচিৎ গৃহীত হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে এক সংগ্রহশালা কর্মীর মুখে শোনা গিয়েছিল যে গুজরাটের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংগ্রহালয়ে স্থিত লোকশিল্পের অন্তর্গত বিশেষ এক ধরণের বস্ত্রশিল্পের একটি প্রদর্শনীতে ঐ বস্ত্র ও অন্য অলঙ্করণের স্রষ্টা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে (যিনি নিজে লোকশিল্পী) আমন্ত্রণ করে প্রদর্শক ও ব্যাখ্যাকারীরূপে কাজ করিয়ে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেছে দর্শকদের তরফ থেকে।

লোকশিল্প সংগ্রহের সম্ভাবনাময় অনুসন্ধান—লোকশিল্পের প্রদর্শন কক্ষে বহু জিনিষ বা নিদর্শন থাকে। যুক্তিসম্মত প্রদর্শনের প্রচেষ্টা সংগ্রহশালা কর্মীকে লোকশিল্পের এমন অনেকদিক সম্পর্কে সচেতন করে তোলে যা অন্যভাবে সম্ভব হয় না। কলকাতার একটি লোকশিল্প সংগ্রহে পূর্বভারত সমেত ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের কিয়দংশের একটি সংগ্রহ একই কক্ষে রক্ষিত। এর থেকে বর্তমান লেখকের কয়েকটি কথা মনে হয়েছে। যেমন মনত করা বা 'থানে' চড়ান'র জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার নিয়ে একটা অর্থবহ প্রদর্শনী করা যায়। হাতীর বা গরুর পুতুল বা অন্য ধরণের রূপায়ণের সর্বভারতীয় প্রচলন ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজনীতার দিকে আমাদের সচেতন করে তোলে। আবার লোকশিল্পের এই সংগ্রহ থেকে দেখা যায় পূর্বভারতের অর্থাৎ আসাম, মিথিলা, ওড়িশা প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমের লোকশিল্পে আঞ্চলিক পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে একটা মূলানুগ ও স্পষ্ট রূপকল্পনার ঐক্য রয়েছে। সর্পদেবী মনসা বাংলায়, আসামে ও নিকটস্থ বা

সন্নিহিত অঞ্চলে এমনি একটা ঐক্যকে প্রতিফলিত করে। বাংলার ও ওড়িশার দশাবতার তাস, মিথিলা ও বাংলার কাঁথা, বাংলা ও আসামের চৌকা পট, বাংলা ও আসামের পুঁথির পাটা, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের কাঠের কাজ আর এক ধরণের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ ধরণের সমীক্ষা বা বিবরণমূলক বিশ্লেষণ আজও দুষ্প্রাপ্য। বাংলার জনগণের এক বৃহত্তম ও প্রাথমিক কৃষিজীবিদের ও কারুশিল্পীদের অংশ ধর্মে ইসলামকে অনুসরণ করেন। বিশেষভাবে এঁদের অবদান লোককলার ক্ষেত্রে আদি ও অকৃত্রিম কারণ এদের দেশজ জীবনযাত্রা ধর্মে শিল্পে আচারে উদারতায় ও বিশেষিত পর্যায়ে বাঙালীয়ানাকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু আজও কাঁথায় গাজির পটে, পীরের থানে দেবার ঘোড়ায়, কাচা কাগজের নক্সায়, কালীঘাটের বিশিষ্ট দুলদুল ঘোড়ায়, নানাপ্রকার বস্ত্রশিল্পে ও পুতুলে যে সমস্ত ছাপ বা বিশিষ্ট রীতি ধরা পড়েছে তার কোন ধারাবাহিক মূল্যায়ণ অনুপস্থিত। মাদুর পাটি প্রভৃতির বর্ণচিত্রণে ও বুনটের নক্সাও এ বিভাগের অনুসন্ধানকারী পর্যালোচনার যোগ্য।

লোকশিল্পের কোন সংগ্রহ যদি খুঁটিয়ে দেখা যায় একাধিকবার তা'হলে আরও ক'টি দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন দেখা যায় উনবিংশ শতকের লোকচিত্রকলার বিষয়ে। আমরা দেখি যে বিদেশী পদ্ধতিতে ধাতবপাতের রেখাশ্রিত তক্ষণকে অবলম্বন করে দেশী বিষয়ের (যথা দেবদেবীর চিত্রাবলী) বিদেশী চিত্র উনবিংশের শতাব্দীর শেষ পাদে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতা অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল। অল্পদামের এই চিত্রাবলী লোকশিল্পের সংগ্রহশালায় সাধারণতঃ রক্ষিত হয় না যদিও এর প্রভাব পড়েছে নগরাশ্রিত লোকচিত্রীদের মধ্যে। সমগ্র উনবিংশ শতকে কাঠের পাটাকে খোদাই করে তার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের ছবি কাগজের পুঁথি পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে। এ সমস্ততে ছবিতে অধিক পরিমাণে দেশী ও খানিকটা বিদেশীয় ভাব আছে। লোকচিত্র আলোচনায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবির সঙ্গে মিল অমিল প্রভৃতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংগ্রহালয়ে এসবের অনুপস্থিতি আমাদের বিস্মিত করে। প্রসঙ্গত বলা চলে যে নেপালের কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় গৃহস্থের শুভ কামনায় এক ধরণের একবর্ণ ও একাধিক বর্ণের কাগজের উপর কাঠ খোদাই মুদ্রণের চিত্রের প্রচলন আছে যা লোক শিল্প রূপে বিচার বিশ্লেষণের যোগ্য এবং গৃহের প্রবেশ দ্বারে দেখা যায়। আমাদের দেশে ঘটের প্রয়োজন ও প্রচলন সুদূর প্রসারিত। সাধারণ ভাবে বিভিন্ন মৃৎপাত্র বিভিন্ন গড়নের। কোনটার রূপ আদিম কালের লাউ-কুমড়ো জাতীয় ফলের আকার থেকে এসেছে। কোনটা ধাতব পাত্রের দেহে যে মসক বা স্রুতীক্ষ্ণ কোন বা ভাঁজ যাকে তার রূপকে অনুসরণ করেছে মাটির পাত্রের মধ্যস্থলে বা কানায়। ঘুরো আছে রকমারি একটা স্থিতিশীলতার জন্য। অলঙ্করণের বৈচিত্র্যও অনেক। সারিবদ্ধ সমান্তরাল অগভীর দাগ ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট হয়ে কোন অলঙ্কার সৃষ্টি করে। কাটাকুটি, চকচকে আস্তর, পোড়ানোর কায়দা, রঙের অনুলেপ এসবতো আছেই। আবার একটু লক্ষ্য করে দেখা যাবে যে মানবাদর্শের দেব দেবীর মুখমণ্ডল সংযুক্ত করে মৃৎপাত্রকে পরিণত করা হয়েছে আচারানুষ্ঠানে ব্যবহৃত ঘটে, গণেশ লক্ষ্মীর ঘটে। পাত্রকে সোজা রেখে উল্টে রেখে গায়ে বাহির থেকে সংযোজিত আরোপনের দ্বারা ফণাধারী সাপ দিয়ে তৈরী বিশিষ্ট আকারের মনসাঘট বা দক্ষিণরায় বা বাবা ঠাকুরের প্রতীকী মূর্তি আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত একাধিক

পুতুল নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এসমস্ত মৃৎপাত্র প্রকরণের উৎস থেকে চলে এসেছে। মৃৎপাত্রের এই ব্যাপক ব্যবহারকে প্রসারিত করে সাধারণভাবে লোকশিল্পরূপে অন্য দ্রব্যের বা উপাদানের পাত্র ও তৈজসের পর্যালোচনার অনুপস্থিতি চোখে পড়বার মত। এটা হবার কোন কারণ নেই কারণ গত দুই যুগ ধরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে ও উৎখননে শুধুমাত্র মাটির পাত্রের আকারে, পাত্রের অলঙ্কার, মৃৎপাত্রের গাত্রাবরণ ও স্থায়ী বর্ণানুলেপ ও গড়ন নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুমান ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অগভীর ও চওড়ামুখের মাটির ধুনুচি ও প্রত্নতত্ত্বের একপদ নির্ভর থালিকা অথবা পূজাপার্বণের কোশাকুশি ও প্রাগৈতিহাসের খোলা নালিকার বাটি প্রভৃতির মধ্যে কি কোন রকম সম্পর্ক একেবারেই নেই—একথাটা ভেবে দেখার মত।

এবারে লোকশিল্প সংরক্ষণাগারে অথবা সংগ্রহশালায় বর্তমানকালের গবেষণার কথায় আসা যেতে পারে। অনুসন্ধান সুরু হয় নানানভাবে। উৎসুক অনুসন্ধানকারী একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচিত করে কাজ আরম্ভ করেন ও এক নিদর্শন থেকে অন্য নিদর্শনের সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহের সাহায্যে এমন অবস্থায় আসেন যখন মনে হয় ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে আর বিশেষ কাজ করার নেই। কিন্তু এই পর্যায়েই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর অর্থবহ কাজের সূচনা হতে পারে। একজন কর্মী ধরা যাক বাংলার বস্ত্রশিল্প নিয়ে অনুসন্ধান করে চলেছেন। কর্মকৌশল, প্রতীকী ও বাস্তবানুসারী নক্সা এ সমস্ত দেখার পর তিনি যদি ভেবে দেখেন যে সমস্ত প্রকার বয়নের সর্বব্যাপী পদ্ধতি শুধুমাত্র তন্তুজ পদার্থে সীমাবদ্ধ নয় তাহলে তিনি ক্রমশঃ পাটি মাদুর ও সমজাতীয় বয়নের পদ্ধতি ও নক্সা, ফুলো, ঝুড়ি, ঝাঁপি, ধামা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনমনীয় বুননের গুরুত্ব বুঝতে সমর্থ হবেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন বুনন বা বয়নের কাজ করেন নারীরা বা এক গ্রামাঞ্চলের এমন এক ব্যাপক গোষ্ঠী যাঁদের বর্ণনির্বাচন, নক্সানির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তাঁতের বয়নকারীদের অনুপ্রাণিত করতে পারে অথবা বিপরীতভাবে তাঁতের কাজ অন্য বুননকে প্রভাবিত করতে পারে।

লোকশিল্প সংগ্রহশালা, বুদ্ধিদীপ্ত পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ—একাধিক লোকশিল্প সংগ্রহ ঘুরে দেখারও অনেক সম্ভাবনাময় দিক আছে। যেমন কলকাতার একটা যথেষ্ট সীমিত আয়তনের বিভাগীয় সংগ্রহ দেখলে একথা বুঝতেই হবে যে বাংলার লোকশিল্প ধারা সংগ্রহে উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব নেপালের সন্নিহিত অঞ্চলের সংগ্রহ সম্পর্কে আমাদের সংগ্রহশালা কর্মীরা যতটা উদাসীন ততটা উদাসীন হবার কোন বাস্তব কারণ নেই। এখানে উল্লিখিত ঐ সংগ্রহশালাটির নিদর্শনের সংখ্যা বেশী না হলেও উত্তর ও নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন আদিম গোষ্ঠীর শিল্পকৃতিতে দর্শনীয় হয়ে আছে। আবার অন্য রকম উদাহরণও দেওয়া যায়। কলকাতা ও তার আশেপাশের সংগ্রহে ঘুরে দেখলে চোখে পড়বে যে দেশ বিভাগের বেশ পূর্বের পূর্ববঙ্গের লোককলার নিদর্শন আর দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে চলে আসা লোকশিল্পীদের হাতের শিল্পকৃতির মধ্যে বেশ একটা অনুধাবনযোগ্য পার্থক্য আছে। এই বিষয়টি একটি বিস্তৃত কাজ ও অনুসন্ধান চলতে পারে যদিও এখনও এটি একটি অনাদৃত বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের শিল্পকৃতির বিশেষ কয়েকশ্রেণীর পশুপাখীর আদিমভাবাপন্ন ও অতুলনীয়, পুতুল এবং পূর্ববঙ্গের মধ্যাঞ্চলের 'এয়ো সরা' প্রভৃতি একেবারে দুষ্প্রাপ্য। হয়ত প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। কাজেই এসব নিয়ে দরদ দিয়ে ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসন্ধান না চালান হলে

অপূরণীয় ক্ষতির পথ খোলা থাকবে। পশ্চিম য়ুরোপের ও মার্কিণ দেশের একাধিক সংগ্রহশালায় প্রদর্শনের সঙ্গে পরিচিত আছে ব্রিটিশ মিউজিয়মের নৃতত্ত্ব বিভাগের এমন এক বিভাগীয় অধিকর্তা সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বিশিষ্ট সংশ্লেষণধর্মী বা সমন্বয়ী বিষয় গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের য়ুরোপীয় উপনিবেশে ও সাম্রাজ্যে সেখানকার আদিম ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর লোকশিল্পে সাম্রাজ্য বিস্তারক, নাবিক, বণিক, ব্যবসায়ী, বাগিচা মালিক, প্রশাসক এবং ধর্মপ্রচারক রূপে য়ুরোপে আগমনকারীরা কি ভাবে প্রতিভাত হয়েছেন তার নিদর্শন সহযোগে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছেন। এতে সিংহল, বর্মা, চীন জাপান, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন লোকশিল্প নিদর্শনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

লোকশিল্পের সংগ্রহশালা—পশ্চিমবঙ্গে লোকশিল্প সংগ্রহশালার সংখ্যা বেশী নয়। লোকশিল্প সংগ্রহশালা ছাড়াও একাধিক ব্যক্তিগত সংগ্রহে লোকশিল্পের নিদর্শন সংরক্ষিত। কলকাতার দুটি প্রধান সংগ্রহশালা যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্যপ্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থার প্রদর্শন কক্ষে রক্ষিত। এই দুটি লোকশিল্প সংগ্রহ ঘুরে দেখার অথবা এর সংগ্রহ নিয়ে কাজ করার একটা বিশেষ সুবিধা আছে। এখানে বর্তমানকালের লোকশিল্প সংগ্রহের কাছেই রয়েছে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী তক্ষণ, অনুলেপন ও চিত্রণের আঙ্গিককে আশ্রয় করে প্রাচীনতর ঐতিহাসিক শিল্পদ্রব্য ও প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্বের নিদর্শনরূপে প্রদর্শিত শিল্পসম্ভার। এর ফলে দর্শক সহজেই গত পঞ্চাশ বৎসরে তৈরী খেলনা পুতুলের সঙ্গে দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার খেলনা গাড়ী, চিত্রার্দ্ধ সমন্বিত মৃৎফলক তুলনা করে দেখতে পাবেন। আবার গত দুই তিন শতাব্দীর কালের পোড়ানো মাটির মন্দির ফলককে পাহাড়পুর বা বাণগড় থেকে আহরিত স্থাপত্যক মৃৎফলকে প্রতিফলিত জনজীবনের দৃশ্যের পটভূমিতে স্থাপন করে যথার্থ দেশজ ধারাটি কি তার অনুসন্ধানে রত হতে সমর্থ হন। লোকশিল্পের চিত্ররূপ ছাড়াও বস্ত্রশিল্পের অলঙ্করণের রীতি পাথরে দেবমূর্তির রেখাকৃতির পুষ্পপত্রের সজ্জায় বিধৃত। পালযুগের দেবীমূর্তিতে এ বিষয়টি সহজেই দেখা যায়।

কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলার লোককলার সঙ্গে নিম্ন আসামের ও ওড়িশার লোকশিল্প কলার তুলনামূলক ও পরস্পর-প্রভাবী ভাবনা ও দর্শনের একটি চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। যথার্থভাবে এর ওড়িশা সংগ্রহ ভারতের মধ্যে সুন্দরতম ও বৈচিত্রে অনবদ্য বললে খুব একটা ভুল হয় না। বিহারঅঞ্চলের পুতুল, লোকচিত্র, রাজস্থানী লোককলা ও দাক্ষিণের পুতুল ও ইন্দোনেশিয় লোক ও কারুকলার বিশেষিত সংগ্রহ প্রভৃতি এর অন্যতম আকর্ষণ।

উপরিলিখিত দ্বিতীয় সংগ্রহশালাটিতেও লোকশিল্পের সংগে ইতিহাসের ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোককলার তুলনামূলক বীক্ষণের ও বিচারের একটি বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক মৃৎপাত্র, মৃৎভাস্কর্য ও অন্যান্য নিদর্শনের সংগ্রহে ও উৎখননে এই রাজ্য প্রত্নসংস্থার সংগ্রহটির সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান আর নেই। কাজেই লোকশিল্পের আদিমতম রূপ নিরীক্ষণের এমন একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করা নিশ্চয়ই লোককলার ছাত্র-শিক্ষকের ও গুণগ্রাহী জননাধারণের অবশ্য কর্তব্য। এই প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহে কলকাতা ও তৎপার্শবর্তী অঞ্চলের ও মুর্শিদাবাদের চিত্রকলার একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ আছে। উত্তরবঙ্গের শিল্পনিদর্শনও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষক।

কলকাতার সর্ববৃহৎ সংগ্রহালয় ভারতীয় যাদুঘরের শিল্প বিভাগে একটি মন্তব্য ও ব্যাপক সংগ্রহ রয়েছে ভারতীয় কারুকৃতি ও লোককলার। এছাড়া এখানে রয়েছে ভারত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সন্নিহিত এশীয় সংস্কৃতির কারুকৃতির অমূল্য নিদর্শন। এখানে নানা ঐতিহাসিক ও বিবর্তনমূলক কারণে ব্যবহারিক কারুকৃতিই অধিকতর মূল্য ও স্থান অধিকার করে আছে। অকৃত্রিম লোককলার সংগ্রহ এখানে অপেক্ষাকৃত কম। তবে এখানে অনিসন্ধিৎসু দর্শকের একটা বিশেষ সুযোগ আছে ঐ সংগ্রহালয়ের প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের ও নৃতত্ত্ব বিভাগের নিদর্শন সমূহ লোককলাকে আরও গভীর ভাবে বোঝবার জন্য। লোককলা সংগ্রহের উপযুক্ত প্রকাশনার একটা বিশেষ অভাব প্রতিষ্ঠানে। তবে এই সংগ্রহের পূর্বভারতীয় জিনিষ আমাদের বার বার দেখবার যোগ্য।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের অবনীন্দ্র নন্দলাল ও তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত একটি লোককলার সংগ্রহ দর্শন যোগ্য। এখানে চিত্রকলার ও বঙ্গীয় লোকশিল্পের সব বিভাগের কিছু কিছু সংগ্রহ ছাড়াও অন্যান্য স্থানের সংগ্রহ রক্ষিত। কিছুদিন পূর্বে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এক শিক্ষকমশায় বাংলার লোককলার পুনরুজ্জীবনে ও সামাজিক স্বীকৃতির প্রসারে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই বিষয়টির সম্পর্কে বিস্ততর অনুসন্ধানের অবকাশ অবশ্যই কর্তব্য। এই ধারার সত্যকারের মূল্যায়ণের জন্য।

হাওড়া ও বাঁকুড়া জিলাদ্বয়ের দুটি আঞ্চলিক সংগ্রহে লোকশিল্পের নিদর্শন দর্শনযোগ্য। এর মধ্যে বাঁকুড়ার প্রতিষ্ঠানটিতে পাটা (চিত্রিত), পট, স্থানীয় বস্ত্রশিল্পের, পোড়ামাটির ও কাঠের কাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। হাওড়ার প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ দুটি কারণে অনুসন্ধানীর কাজে লাগবে বেশী। লোকশিল্পকলার সংগৃহীত বস্তু বা কলা নিদর্শনের মধ্যে এখানে হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রদর্শই সংখ্যায় অধিক। সংগৃহীত প্রদর্শ দ্রব্যের চিত্র সম্বলিত তালিকা ও বিস্তারিত বর্গীকরণের প্রয়াসের দ্বারা এই সংস্থার বিশেষত্ব চিহ্নিত। এদিক থেকে এই সংগ্রহালয়ের কাজ অনুসরণযোগ্য। হুগলী জিলার দুটি স্থানে লোককলার কিছু নিদর্শন আছে। এর মধ্যে একটি অঞ্চল হাওড়া থেকে উত্তর পশ্চিমের রেলপথের ধারেই অবস্থিত। এখানের চিত্রিত রথের পাটাতন সুন্দর। অন্যদিকে কাঠের কাজের জন্য তাঁতবস্ত্রের কেন্দ্রের নিকটবর্তী এই জেলার আর একটি গ্রামীণ সংগ্রহালয়ে কাঠের ভাস্কর্য ও কাঠ খোদাইয়ের ভাল নিদর্শন আছে।

হস্তশিল্প বা কারুকলার পরিপ্রেক্ষিতে বা দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত হবার মত সংগ্রহশালা আছে দুটি। একটি মধ্য কলকাতার এক অভিজাত পল্লীর রাজপথের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচালিত, একটি আবাস গৃহের একাংশে রয়েছে। এখানে রয়েছে অতি উত্তম আলোকচিত্র ও পরোক্ষ চিত্রণের পর্যায়কৃত সংগ্রহ ও উত্তম লোকশিল্প ও কারুকলা বিষয়ক গ্রন্থাগার। এই প্রতিষ্ঠান পূর্বে লোককলার একটি নক্সা বা অলঙ্করণের সমীক্ষা পরিচালনা করেছিল। রূপরেখার মাধ্যমে ও আবশ্যিক সংবাদ সংযোগে তৈরী এখানকার পুরাতন নক্সার স্বয়ম্ভর পত্র সম্ভার বহু কর্মীকে একটা অবশ্য করণীয় কার্যক্ষেত্রের সন্ধান দেবে। এখানকার সংগ্রহের প্রকৃতি সর্বভারতীয় হলেও এখানের প্রথমশ্রেণীর বঙ্গীয় লোককলার সংগ্রহ একাধিকবার দেখবার মত। এখানকার কোন কোন চিত্রিত তালিকাপুস্তক ও পত্রিকাদির এখনও যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই বর্গের আর একটি লোকশিল্প ও

কারুকলার সংগ্রহ কলকাতার অফিসপাড়ার নিকটবর্তী একাধিক তলবিশিষ্ট অফিস বাড়ীর একাংশে স্থান পেয়েছে। এখানে 'উন্নয়ন' মৃথীন কারুকলা ও লোক শিল্পের সংগ্রহ লোকশিল্পের মূলানুগ ও মৌলিক নিদর্শন পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। সুতরাং এই দুই প্রকৃতির মধ্যে তুলনার জন্য এখানে রয়েছে এক বিশেষ সুবিধা।

বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় হস্তশিল্প সংস্থার পরিচালিত একটি সংগ্রহালয়ে বেশ কিছু বঙ্গদেশীয় লোককৃতি ও কারুশিল্পের নিদর্শন দেখা যাবে। সম্প্রতি ঐ নগরের ভারতীয় জাতীয় সংগ্রহালয়ের একটি বিভাগে বঙ্গীয় লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করার একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বঙ্গীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব ক্ষেত্রে বাংলার নিকটবর্তী পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, ভুবনেশ্বর, গৌহাটি প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নয়াকেন্দ্র ও লোকশিল্প ও স্থানীয় কারুকলার সংগ্রহালয়ের প্রদর্শ সংগ্রহ ভাল করে এবং আরও সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। বর্তমানে ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয় ও নাগাভূমিতে আরও কয়েকটি সংগ্রহালয় রয়েছে। এই সমস্ত সংগ্রহালয়ের কোন কোনটিতে স্থানীয় উপজাতীয় শিল্প সাদরে প্রদর্শিত সংগৃহীত, আবার কোন প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র তথাকথিত ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রাধান্যে সংগ্রহালয়ের অন্য বিভাগ অবহেলিত। পশ্চিমবঙ্গের লোককলার অধ্যয়ন নিশ্চয়ই আবশ্যিকভাবে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুকলার সংগ্রহালয়কে বাদ দিয়ে হতে পারে না।

বঙ্গীয় লোককলার আলোচনায় নৃতত্ত্বের কয়েকটি সংগ্রহালয়ের সঙ্গে মতবিনিময় ও যোগাযোগের প্রয়োজন দেখা দেবে। কলকাতা, গৌহাটি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের কথাকথিত, 'উপকরণ' সংগ্রহ লোককলার অনুসন্ধানকারীদের নজরে পড়বার মত। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ বিভাগে অরুণাচল সহ উত্তর পূর্বের অন্যান্য ধারার সংগ্রহ, যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে তাতে বেশ কিছু উপজাতীয় কলার প্রদর্শন আছে। কলকাতার নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা, ভারতীয় যাদুঘরের নৃতত্ত্ববিভাগ অবশ্যই একদিক থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সংবাদাদি দিতে পারবে। রাঁচিস্থিত বিহার উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের সংগ্রহালয়ও এই পরিধির অন্তর্গত।

ভারতের বাইরে বঙ্গীয় লোককলার প্রধানতম নিদর্শনের সংগ্রহ লণ্ডন শহরের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট সংগ্রহালয়ে এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী সহ আর কটি প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে আছে। কাঁথা ও পটের সংগ্রহই এ পর্যন্ত আর্চর, আরউইন প্রভৃতি অনুসন্ধানকারী লিখিত বিবরণের সাহায্যে খানিকটা পরিচিত হয়েছে। বাংলার লোকশিল্পের সংগ্রহ আমেরিকার কোন কোন সংগ্রহালয়ে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত। তবে এ সমস্তের বেশীর ভাগই পূর্বাপর ও যথাযথ নথিবদ্ধ নয়। তার ফলে এ সমস্তকে নির্ভর করে বিদেশে ও তার খানিকটা অবশ্যম্ভাবী অনুগামীদের দ্বারা এদেশে নানা প্রকৃতির মতবাদের জন্ম ও মৃত্যু ঘটে চলেছে। প্রায় চার পাঁচ বৎসর পূর্বে ডঃ ক্র্যামরিশ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সমন্বিত একটি চিত্রিত তালিকা (যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রদর্শনীর পরিচায়ক রূপে প্রকাশিত) বেশ খানিকটা কার্যপোযোগী, এর প্রধানতম গুণ যে এতে গ্রাম্য আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে উপজাতিদের কলাকৃতির একটা সমন্বয়ী সমীক্ষা করা হয়েছে।

সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প প্রকাশন—লোকশিল্প সংরক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক উপযুক্ত

প্রকাশনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপযুক্ত প্রকাশনা ছাড়া লোকশিল্প ও লোকায়ত ধারার আলোচনা থেমে যেতে বাধ্য। বর্তমানে বঙ্গীয় লোকশিল্প বিষয়ক পুস্তকাদির বিশেষ অভাব আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি ইংরাজীতে লিখিত উপজাতীয় কল্যাণ সংস্থার অন্তর্পাতী এক প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় এ সম্পর্কে কোন কোন আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের বাণিজ্য দপ্তর থেকে ইংরাজী ভাষায় আর একটি বহু চিত্র শোভিত সুন্দর আলোচনাগ্রন্থ বর্তমান। এ ছাড়া রাজ্য প্রত্নসমীক্ষার মৃৎফলকের (হেতমপুর মন্দির অঞ্চল) একটি পুস্তিকা ও কয়েকটি শক্ত কাগজের চিত্রিত 'কার্ড' আছে। তবে এ বিষয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর বর্গীকৃত ও বিভাজিত চিত্রমালা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি হতে প্রকাশিত। এতে বাঁকুড়ার পাটা, মেদিনীপুরের পুঁথিচিত্র, কালীঘাটের পট, জড়ানো পটের আংশিক ছবি প্রভৃতি স্থানলাভ করেছে। বাংলার খেলনা ও পুতুলের বর্গীকৃত ও বর্ণনামূলক তালিকা গ্রন্থটিও (ইংরাজীতে) এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত। কলকাতার নিকটবর্তী চব্বিশ পরগণার একটি প্রতিষ্ঠানের একটি ইংরাজী বাংলা দ্বিভাষিক পরিচায়িকা আছে। হাওড়ার প্রতিষ্ঠানটির আছে একটি সাধারণ বিচিত্র পরিচায়িকা। এটি বাংলা ভাষায় রচিত।

উপরের বিবরণ থেকে সহজেই একটি প্রশ্ন মনে আসে। আশ্চর্য লাগে যে বঙ্গীয় শিল্পকলার দিকটি নিয়ে প্রধানতম প্রকাশিত গ্রন্থ ও চিত্রমালা প্রায় সর্বাংশে ইংরাজীতে লিখিত। কিন্তু লোককলার প্রকাশনা এমন হওয়া চাই যাতে সেটার পঠন পাঠনের সুযোগ সর্বসাধারণে লাভ করে। কারণ ব্যাপকতম প্রসারতার সাহায্যেই আমাদের অনেক পূর্বতন ত্রুটি সংশোধিত হতে পারে। সংগ্রহশালা প্রকাশনের মূল ভাষা ও চিত্র প্রকাশনার বিজ্ঞপ্তি ভাষা বাংলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক স্তরে দুটি কাজ এখনই করার মত। প্রথমতঃ সব লোককলা সংগ্রহেরই অল্প মূল্যের বা স্বল্প আয়তনের সাধারণ লোককলা বিষয়ক পরিচায়ক পুস্তিকার আশু প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। লোকশিল্পের বৃহৎ সংগ্রহ সমন্বিত সংগ্রহালয় সমূহের একটা প্রধানতম সমস্যা ব্যাপক পরিচায়িকা তালিকা বা সমীক্ষা সম্পর্কিত প্রকাশনের অর্থমূল্যের ও অর্থবিনিয়োগকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এই ব্যাপারে কাজ বন্ধ করে না রেখে যদি বিভিন্ন প্রকৃতির বিভাগীয় সংগ্রহে সুন্দরভাবে ভাঁজ করা বা পাট করা পরিচায়ক পত্রে একটি বা দুটি ছবি দিয়ে পরিচায়কপত্র মুদ্রণ করলে অনেকটা কাজ এগিয়ে থাকবে ও কর্মী দর্শক এবং সংগ্রাহকদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। লোকশিল্পকে কি ভাবে ও পদ্ধতিতে শিল্প ও সংস্কৃতি আলোচনার ও কিশোরদের পাঠ্য ও আনন্দময় বাইরের পড়ার ক্ষেত্রে নিয়ে আসা যায় সেটা একটা পৃথক ও বিশেষিত আলোচনা ও অন্বেষণার বিষয় হতে পারে।

লোকশিল্প আলোচনার যদি আমরা একটা সুসংবদ্ধ রূপ আশা করে থাকি তাহলে দুই শ্রেণীর মানুষের কাজকর্মকে সংগ্রহালয়ে যথেষ্ট আদর ও যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। লোকশিল্পের সংগ্রহালয়ে একধরণের অধস্তন কর্মী আছেন যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে লোকশিল্প নিদর্শনকে রক্ষণাবেক্ষণের ফাঁকে ফাঁকে অথবা ঐ কাজ করতে গিয়েই বিভিন্ন প্রদর্শের মিল অমিল, সৌন্দর্য ও অর্থ সম্পর্কে গভীর ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ ধরণের প্রবীণ কর্মীদের অনেকেই গণসমীক্ষণকারী গবেষক, উৎসাহী সংগ্রাহক ও ছাত্র, লোকশিল্পের রসবেত্তা ও গবেষকদের সংস্পর্শে এসেছেন দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়ে। সংগ্রহালয়ে আগমনকারীদের সঙ্গে অনেক সময়ে এঁরা ধারাবাহিক-

ভাবে শিল্প দ্রব্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। এই শ্রেণীর কর্মীরা অনেকক্ষেত্রেই সংগ্রহ করার কাজও করেছেন। এঁদের দিয়ে যদি সহজ ও প্রাণবন্ত বাংলাভাষায় লোকশিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট আচার আচরণের বিভিন্ন রচনা সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ আগ্রহ ভরে গ্রহণ করেন, পত্রিকা পরিচালক যদি এঁদের রচনা যত্নের সঙ্গে মুদ্রিত করেন তা হলে একটা মস্ত কাজ হয়।

ঠিক এই পর্যায়ের কাজ হতে পারে আরও গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্পী বা শিল্পীপরিবারের প্রবীণ ও নিপুণ ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে। যদি একশ্রেণীর ছাত্র ও গবেষকরা কেবল মাত্র মুদ্রিত মাধ্যমে হাতড়ে না বেড়িয়ে এদের বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে ডেকে এনে অথবা তাঁদের শিল্প আবাসে গমন করে কাজ আরম্ভ করেন তা হলে উত্তম হয়। প্রথমে আলোচনা, পরে শ্রুতিলিখন শেষে মূল বক্তা বা শিল্পীর সহিত আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণমূল্যায়ন করে নিয়ে লোকশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের ও পদ্ধতির বিবরণ যদি রচিত হয় তাহলে তাতে কাজ ও অর্থবহ উদ্যমের সুস্থ প্রকাশ হতে পারে উপযুক্ত মুদ্রণের সাহায্যে।

লোককলার ক্ষেত্রে লোকশিল্পনিদর্শনের নথিপ্রকরণ বা বর্ণনামূলক বর্গীকৃত তালিকা প্রণয়ন একটা অতি বিশিষ্ট কিন্তু বর্তমানে অবহেলিত কাজ। এ বিষয়ে লোকগণনা বিভাগের একটি হস্তশিল্পবিষয়ক গবেষণা কার্যালয় বেশ খানিকটা কাজ করে এগিয়ে গেছেন। নৃতত্ত্বের কোন বিশিষ্ট সংগ্রহালয় এরকমের কাজ করেছেন। বঙ্গীয় লোকশিল্প বিষয়ে অনুগামীদের অতি পরিচিত কর্মীর কাজও উল্লেখযোগ্য। এখন এসমস্ত ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানও এক আলোচনা চক্রে মিলিত হয়ে একটা সাধারণ নথিপ্রকরণ বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন এবং নথিকৃত তালিকার বিনিময় দ্রুত সঞ্চালনের উপযোগী হলে একই কার্যক্ষেত্রের সংগ্রহালয়সমূহ ও সংগ্রহকারীরা গভীরভাবে উপকৃত হবেন।

শিল্পক্ষেত্র পরিদর্শন ও নথিপ্রকরণের যদি একটা সহজবোধ্য ও সাদামাটা পুস্তিকা রচিত হয় তা'হলে গ্রাম-গ্রামান্তের শিক্ষক ও সংস্কৃতি কর্মী ও ছাত্রেরা আঞ্চলিক শিল্প সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে সফল কাজ করতে সমর্থ হন। এ ধরণের এক পুস্তিকার অভাব আজ যথেষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে।

আমাদের লোককলা সংগ্রহালয় সমূহ কি বেদনাদায়ক অবস্থায় নিমজ্জিত সেটা বোঝা যাবে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলেই। কলকাতা শহরের লোককলা সংগ্রহ ও সংগ্রহশালার বেশ কয়েকটি বিভিন্ন ব্যস্ত কাজের অফিস বাড়ীর এক বা একাধিক তলকে আংশিকভাবে দখল করে অস্তিত্ব বাঁচাচ্ছেন কোনরকমে। কোন একটি সংগ্রহের প্রায় অধিকাংশ নিদর্শন বন্ধ বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে। কোথাও উপযুক্ত নির্দেশিকা নেই। কোথাও কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে দিনমজুরের মত দৈনিক মাহিনায় কাজ করে যাচ্ছেন। যদিও এ প্রতিষ্ঠানটি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে।

উপযুক্ত স্থানাভাবে এই আলোচনাটি ইচ্ছামত আরও উদাহরণ সহযোগে তার যথার্থ বক্তব্যকে হয়ত তুলে ধরতে সমর্থ হয়নি। তবে সংগ্রহালয়ের বিভিন্ন কাজে যথাসাধ্য উপস্থিত থেকে লোকশিল্প ও লোকাচার সংক্রান্ত হাওড়ার দুইজন উৎসাহীকর্মীর ক্ষুদ্র পত্রিকায় লেখকের কয়েকটি ভুল ধারণা মূল শিল্পক্ষেত্রে সরেজমিনে তদন্তকারীর বিবরণে ঠিকমত বুঝে ওঠার পর এই আলোচনাটি রাখা গেল সহকর্মী ও অগ্রবর্তীদের দৃষ্টির সামনে।

মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যসুন্দর দাস

কুমারশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র প্রভাবমুক্তির প্রয়াস যুগের কবি মোহিতলাল। এই যুগকে বলা চলে অবক্ষয়ের যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হয়েছে। পাশ্চাত্যে শাশ্বত মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ছে। টি, এস, এলিঅট 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' লিখছেন। এই অবক্ষয় ও আশ্রয়হীনতার পরোক্ষপ্রভাব বাংলাসাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র লিখছেন শ্রীকান্ত (১৯১৬) যাকে বলা যেতে পারে তৎকালীন বাঙালী যুব সমাজের আশ্রয়িক সমস্যার কাহিনী। এইকালে বাংলা কবিতাতেও এই ভাঙার যুগ প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবতন্ময় ও অস্পষ্ট রহস্যলোকের বিরুদ্ধে, মনন প্রধান ও বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রচনার প্রয়াস সূচিত হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রথম চৌধুরীর রচনায়।

তৎকালীন তরুন সাহিত্যিক গোষ্ঠীও বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতায় এই যুগচেতনাকে ধরাবার চেষ্টা করছেন তাদের রচনায়। কিন্তু তাদের 'সাধ ছিল' কিন্তু 'সাধ্য ছিল না'। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাদের মানসিকতায় বিপর্যয়কর আঘাত হেনেছিল ঠিকই। কিন্তু জীবনাদর্শের উপলব্ধিতে গভীরতা না থাকায় তাদের রচনা বহুলাংশে 'সৌখীন মজদুরী'তে পরিণত হয়েছিল। তাই ভাষা ছন্দ বা অলংকার সৃষ্টির অভিনবত্বও এদের কল্পনা বা অনুভূতির দৈন্যকে লুকোতে পারে নি। বস্তুত পক্ষে, সত্য জীবনধর্মের সঙ্গে এদের যোগাযোগ যতটা ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটেছিল পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে। ফলে এরা যাকে ভাবলেন নবসৃষ্টি আসলে তা হল অনুকরণেরই নামান্তর। এদের মধ্যে যাঁরা পরানুকরণ ও নবত্বের মোহ ত্যাগ করে, আপন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস, শিক্ষা, রুচি ও অভিজ্ঞতাকে সত্যোপলব্ধির সাধনায় নিয়োজিত করেছিলেন মোহিতলাল তাদের অন্যতম ও বিশিষ্টতম।

ঊনবিংশশতকে বাংলার নবজাগরণের যুগে বঙ্গসাহিত্যে যে বিপুল প্রত্যয় ও সত্যসুন্দরের সুগভীর আদর্শ দেখা দিয়েছিল, মোহিতলাল বিংশ-শতাব্দীর অস্থিত যুগ চেতনার সাহিত্যে পূর্বতন সেই সুমহান আদর্শকেই নবরূপ দান করতে চেয়েছিলেন। এর জন্যে তিনি পলায়ন করেন নি, অনুকরণ করেন নি, অনুসরণ করেন নি—তিনি যা করেছেন তা হল স্বীকরণ, তিনি তাঁর যুগকে স্বীকার করেছেন। এর জন্যে তাঁকে হয়তো সরে যেতে হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যসরণী কিংবা 'রবিবৃত্ত' থেকে।

বস্তুত পক্ষে মোহিতলাল রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন না। তিনি ছিলেন 'রবিবৃত্ত' বিরোধী। তাঁর ভাষায় রবীন্দ্রগোষ্ঠী 'ছাতারের দল'। মোহিতলাল ঐ 'ছাতারের দল'এ গিয়ে ভিড়তে চাননি। এর কারণ তার সচেতন আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ। এই আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ একদিকে তাঁকে যেমন বিশিষ্টতা দান করেছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁকে দুর্ভাগ্যের সঙ্গী করেছে। সে যাই হোক, রবীন্দ্রগোষ্ঠী থেকে সরে এসে মোহিতলাল গুরু হিসেবে বরণ করে নিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেনকে। (১) নিছক আত্মীয়তার খাতিরেই যে মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথকে মেনে নিয়েছিলেন একথা বিশ্বাস করা যায় না।

দেবেন সেনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে দুটি কারণ আছে—

১। দেবেন সেনের রূপতৃষ্ণার সঙ্গে মোহিতলাল আপন মানসিকতার সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন।

২। রবীন্দ্রযুগে কাব্যরচনা করেও দেবেন্দ্রনাথ তার গঠনরীতির শৈথিল্য, ঘরোয়া দাম্পত্য প্রেমের চিত্র এবং আত্মতুষ্ট ভাবনা নিয়ে যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে অন্যান্য রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। মুগ্ধকারী রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার এই দেবেন্দ্র প্রয়াস, অহংসম্পন্ন মোহিতলালকে আকৃষ্ট করেছিল।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের পথিক হলেও মোহিতলাল প্রথম দিকে পুরোপুরি রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর 'স্বপন পসারী'র (১৯২১) বহু কবিতাই, রবীন্দ্র প্রভাবিত। 'স্বপন পসারী'তে মোহিতলালের রোম্যান্টিক ভাবনা পক্ষবিস্তার করছে 'স্বপনের পুরে'। 'পূর্ণিমা স্বপ্ন' ও 'স্বপন পসারী' কবিতাদুটিতে মোহিতলালের রোম্যান্টিকতার স্বাদুরূপটি ধরা যায়। এই রোম্যান্টিক ফেনিলতার মধ্যেও মোহিতলালের আপন বৈশিষ্ট্যটি মাঝে মাঝেই ফুটে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যটি বুঝতে গেলে মোহিতলালের অন্তর্নিহিত সত্তাটিকে বুঝতে হবে। মোহিতলালের অন্তর্নিহিত এই সত্তাটি হল—'সত্যসুন্দর দাস' যে প্রকাশিত হবে পরবর্তীকালে 'শনিবারের চিঠি'তে। চর্যাপদের সাধক কবিদের মতো মোহিতলাল দেহকে স্বীকার করেছেন।

"দেহ অরনিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা।"

কিন্তু দেহতেই তাঁর কাব্যকলা সীমায়ত নয়, তাঁর যাত্রাপথ দেহাতীত অসীম সৌন্দর্যলোকে। তাই বাংলা কবিতায় বলিষ্ঠ ভোগবাদের সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি যে আসলে 'সত্য' ও 'সুন্দরে'র দাস একথা কখনও বিস্মৃত হননি—

"মোর কামকলা কেলি উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন বিলাস,
আমি যে বধূরে কোলে করে কাঁদি যত হেরি তার মুখ,
* * *
আমার পীরিতি দেহাতীত বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ লাখ যুগে আঁখি জুড়ায় না!
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!"

["স্মরগরল" : স্মরগরল]

মোহিতলাল মজুমদারের একই সত্তার দ্বৈতরূপ 'সত্যসুন্দর দাস' ও কবি মোহিতলাল। 'ক্ল্যাসিসিষ্ট' সত্যসুন্দর দাস এবং উদ্দাম 'রোমান্টিক' কবি মোহিতলালের দ্বন্দ্ব মোহিতলাল মজুমদারের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই দ্বন্দ্বের ফলে মোহিতলাল বিভিন্ন গোষ্ঠী, বন্ধু, পরিজন, স্থায়ী সুখকর জীবন সবকিছু থেকে ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তার জীবনের বিভিন্ন পর্বগুলিকে ক্রমপর্যায়

বিভক্ত করে, এ সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

প্রথম পর্ব : রবীন্দ্র অপসারী, দেবেন্দ্র অনুসারী।

দ্বিতীয় পর্ব : শব্দচয়নে সত্যেন্দ্র অনুসারী, নজরুল সান্নিধ্য, 'ভারতী', 'মানসী', 'বীরভূমি', 'মোসলেম ভারত' প্রবাসীর সঙ্গে যুক্ত।

তৃতীয় পর্ব : নজরুল বিরোধী।

চতুর্থ পর্ব : রবীন্দ্রবিরোধী, 'কল্লোল' পুরোধায়ী, 'কালিকলমে'র সঙ্গে যুক্ত।

পঞ্চম পর্ব : 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত; কল্লোল বিরোধী।

ষষ্ঠ পর্ব : 'শনিবারের চিঠি' বিরোধী।

সপ্তম পর্ব : 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রচারের ব্যর্থ চেষ্টা।

নবযৌবনের কাব্য 'স্বপন পসারী'তে মোহিতলাল যে রবীন্দ্র অপসারী তার উদাহরণ "অঘোরপন্থী" কবিতাটি—

"জীবন মধুর! মরণ নিঠুর তাহারে দলিব পায়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হয়ে যাক হিতাহিত জ্ঞান!
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শঙ্কর মত তুলি—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি!
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড় গো সবাই ঢুলি!"

["অঘোরপন্থী" : স্বপনপসারী]

প্রচলিত সাহিত্যগোষ্ঠীগুলি থেকে তিনি যে দূরে সরে যাচ্ছেন একথা মোহিতলাল নিজেও জানতেন। 'স্বপন পসারী' প্রকাশিত হবার দু' বছর বাদে ১৯২৩ সালের জুন মাসে তিনি প্রবোধ সেনকে লিখেছেন—"…বর্তমান সাহিত্য সমাজের সহিত আমি কখনই সন্ধিস্থাপন করিতে পারি নাই, বরং ক্রমশ যত দিন যাইতেছে আমি তাহার ক্ষুদ্রতা ও মিথ্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে অপসারণ করিতেছি…"২ যে তাত্ত্বিকতার জন্য তিনি দূরে সরে যাচ্ছিলেন সে সম্পর্কেও মোহিতলাল অবহিত ছিলেন। ঐ বছরই আগষ্ট মাসে লেখা একটি পত্রে তিনি প্রবোধ সেনকে লিখেছেন—"…বর্তমানযুগ বিশেষ করিয়া দেহবাস্তবের যুগ, মানসবিলাসের যুগ নয়—নচিকেতা যেমন যমকে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তেমন করিয়া দেহের অন্তরালে যে সত্যপুরুষ আছেন, জীবনের রহস্যসাগরে ডুব দিয়া, তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিতে হইবে। মানসিকতা একটা ব্যাধিমাত্র—ওটা প্রবল হইলে, বিদ্যা নয় অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইতে হয়; ও পথে জ্ঞানী হওয়া যায় গুণী হওয়া যায় না; 'অহং' প্রকট হইয়া ওঠে—ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়া সার্বভৌমিক চেতনা বা পরাজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না।"২ এই আত্মোপলব্ধি সত্ত্বেও মোহিতলাল 'অহং' বিসর্জন দিয়ে 'সার্বভৌমিক চেতনা'য় পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ হতে পারেননি। কারণ রোমান্টিক 'অহং' এবং ক্ল্যাসিকাল 'সার্বভৌমিক চেতনা'

—উভয়ই তাঁর মধ্যে অবস্থান করছিল 'কবিসত্তা' ও 'সত্যসুন্দর দাস' রূপে। এই 'অহং'-এর প্রাবল্য তাকে পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-বিরোধী করে তুলেছিল আর 'সত্যসুন্দর দাসে'র নিষ্পেষণ তাকে 'কল্লোল' বিরোধী করে তুলেছিল। তবু রবীন্দ্রনাথই নন এই 'অহং'-এর বিরুদ্ধধর্ম মোহিতলাল ও নজরুল সম্পর্কে ছেদ ঘটিয়েছিল। এমন কি মোহিতলাল তার "দ্রোণগুরুতে" অভিশাপ পর্যন্ত দিয়েছেন নজরুলকে। (৩) "দ্রোণগুরুতে" মোহিতলাল নজরুল বিদ্বেষী আর "মোহমুদ্গর" এ রবীন্দ্র-বিরোধী—

"ঊর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা মাধবী,
নেহারিয়া নীহারিকা ছবি,—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধুচুষি নীরন্ধ্র অধরে,
উপহাসি দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বৃভুক্ষু মানব লাগি রচি ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকালে
কতদিন ভুলাইবে মর্তজনে চিলাইয়া মোহন আসর,
—হে কবি বাসর ?"

["মোহমুদ্গর" : বিস্মরণী]

রবীন্দ্রবিরোধী এই মোহিতলাল হলেন বিস্মরণী (১৯২৬) : মোহিতলাল—'কল্লোলে'র দিশারী "মনে হয় যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা ও সংস্কারাহিত্য, তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়" (৪) রবিদ্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপ পেরোনোর জন্য 'কল্লোলে'র আদর্শ হলেন মোহিতলাল—"আমাদের তরুণ বয়সে, যখন রবিদ্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপটি আমরা পার হচ্ছিলাম তখন যে দুজন কবিতে আমরা তখনকার মতো গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, তাদের একজন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর একজন বিস্মরণীর মোহিতলাল" (৫) বিস্মরণী এত সাড়া জাগিয়েছিল তার কারণ এ গ্রন্থে মোহিতলালের সত্তার দ্বৈতরূপ এক অপূর্ব সামঞ্জস্যে মিশ্রিত। রোমান্টিক আবেগ এবং রচনাশৈলীর ক্ল্যাসিক দাঢ্য বিস্মরণীর প্রতিটি কবিতাকে গ্রীক ভাস্কর্যের মতো নিখুঁত রূপ দিয়েছে। এই উভয়তঃ বলিষ্ঠতার জন্যেই 'কল্লোলে'র কাছে বিস্মরণীর মোহিতলাল হলেন "আধুনিকোত্তম"। বিস্মরণী প্রকাশের দু'বছর পরে ১৯২৮ সালে মোহিতলাল ঢাকার অধ্যাপক হলেন। মোহিতলালের জীবনের এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কবি মোহিতলাল ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছেন সমালোচক মোহিতলালে। এই সময় তিনি সাহিত্যতত্ত্ব লিখছেন—'শনিবারের চিঠি', প্রবাসী, বঙ্গশ্রীতে। ১৯২৬—১৯৩৬ মোহিতলালের তাত্ত্বিকতার অনুশীলনকাল। মোহিতলালের অন্তর্নিহিত 'সত্যসুন্দর দাস' এবার আত্মপ্রকাশ করেছে। মোহিতলাল 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামের আড়ালে লেখনী ধরেছেন 'শনিবারের চিঠিতে।' 'শনিবারের চিঠি' 'কল্লোল' বিরোধী। 'কল্লোল'গুরু মোহিতলালও ধীরে ধীরে 'কল্লোল' বিরোধী হয়েছেন। কারণ মোহান বোয়ার ও হুট হামসুন পড়া যে দেহাত্মবাদ কল্লোলের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্ছ্বসিত ফেনিলতা সৃষ্টি করেছিল, সেই দেহাত্মবাদ মোহিতলালেও তাত্ত্বিকদেহসম্ভোগের কাব্যতত্ত্বের অনুরূপ ছিল না। তাত্ত্বিকতানিষ্ঠ মোহিতলাল শিষ্যদের এই অনাচার (?) সহ্য করতে পারেন নি।

তিনি 'কল্লোলে'র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন ! সত্যি ভাবতে অবাক লাগে যে মোহিতলাল এক সময় ঈশ্বরকে সম্বোধন করে লিখেছেন—

"তবু আমি চাহি না যে, তব রাজ্যে থাক তুমি চির একেশ্বর।
মোর ক্ষুধা মিটিয়াছে ; শশী সূর্য তোমার বন্দুক ?
আমারও খেলনা আছে প্রেয়সীর সুচারু চুচুক !"

["নাগার্জুন"]

তিনিই আবার কল্লোলের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগকে সমর্থন করছেন।

এর পরের ইতিহাস খুব মজার। 'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোলে'র বিরোধ ধীরে ধীরে মিটে গেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'কল্লোলে'কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই সময়ে মোহিতলালের অবস্থা খুবই করুণ। তিনি রবীন্দ্রবিরোধী আবার তিনি আধুনিকতা (কল্লোল) বিরোধী। এক রবীন্দ্রযুগ আর এক কল্লোলযুগ উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এই দুই যুগের একটিকেও স্বীকার করতে পারেন নি তিনি। এ যেন টমাসমানের নায়ক টোনিও ক্রেগার দোটানার মধ্যে থেকেও যে সম্পূর্ণ 'এলিয়েন'।

এই নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বয়ং একটা যুগ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ রেখে তিনি নবপর্যায় প্রকাশ করেছেন 'বঙ্গদর্শন।'

কিন্তু বঙ্গদর্শনের যুগ যে বহু আগেই অতীত হয়ে গিয়েছে সে সম্পর্কে মোহিতলাল হয়তো সচেতন ছিলেন না। তাই এই নব 'বঙ্গদর্শন'র অকাল মৃত্যু ঘটল। এদিকে সমালোচক মোহিতলালের প্রতিষ্ঠা যখন উদয়াচলে কবি মোহিতলালের প্রতিভা তখন অস্তমিত। স্মরণরল থেকেই এই অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। আর হেমন্ত গোধূলি তো 'নষ্টালজিক' কাব্য যেখানে মোহিতলাল আবার ফিরে যেতে চাইছেন 'স্বপন পসারী'র জগতে। এইখানেই কবি মোহিতলালের অপমৃত্যু। আসলে মোহিতলালের মধ্যে যদি সমালোচক, তাত্ত্বিক 'সত্যসুন্দর দাস' নিহিত না থাকত তাহলে কবি মোহিতলাল হয়তো অধুনা পঠিত হতেন। কিন্তু 'সত্যসুন্দর দাসে'র কাছে 'কবি মোহিতলাল পরাজিত হয়েছিলেন। তাহলে বিস্মরণী এত সাড়া জাগিয়েছিল কেন ? তার কারণ এ কাব্যগ্রন্থে Idea of perfection (সত্যসুন্দর দাস) এবং Perfection of experience (কবি মোহিতলাল) সমান অংশীদার তথা একে অন্যের পরিপূরক হয়েছিল। ম্যালার্মে তাঁর 'বিশুদ্ধ কবিতার' তত্ত্বটিকে কাব্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কিন্তু বিস্মরণীর মোহিতলাল তাঁর কাব্যে অংশত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তাঁর তাত্ত্বিক ভোগবাদের তত্ত্বটিকে। এটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

কিন্তু সমস্ত কবিতাকে একটিমাত্র কাব্যদর্শনের ভিত্তিতে লেখার চেষ্টা করায় মোহিতলালের কবিতা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছিল। তত্ত্ব ও মননের পুনঃ পুনঃ চর্চা করে মোহিতলাল তাঁর কবিতাটিকে নিজেই ধ্বংস করেছিলেন। ফরাসী Parnassianদের মতো কবিতার শুদ্ধ রূপটি নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত হবার ফলে অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক সত্যসুন্দর দাসটিকেই তিনি পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিলেন। মোহিতলাল নিজেও এটা জানতেন—"আমি popular হতে পারলাম না, পারবও না। আজকালকার দিনে popularity ই হচ্ছে প্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রমাণ।"৬ প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার

বেদনা মোহিতলালকে বিষণ্ণ করেছিল—"বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি out of time, এবং বোধ হয় out of placeও বটে। I am fallen on evil days and on evil tongue, আমাকে কেহ বুঝিবে না, আমি বড়ই স্বতন্ত্র, বড়ই একাকী, যাহারা আমাকে ভালবাসিয়াছে এবং বুঝিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে তাহারাও শেষে বুঝিতে না পারিয়া মর্মাহত হইয়াছে।"৬ মোহিতলাল প্রতিষ্ঠা পান নি সত্যি। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে রবীন্দ্রবিরোধী কাব্যদর্শে তিনিই পুরোযায়ী। সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি সত্বেও আপন দ্বিভাঁজ সত্তার দ্বৈরথে তিনি বাংলা কাব্যে চিরজয়ী হতে পারলেন না—এটাই ট্র্যাজেডি।

---

(১) মোহিতলালের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নামই হল 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' (১৯১৮ ?) তাছাড়া বহু শব্দ ও উপমা মোহিতলাল সরাসরি দেবেন সেনের কবিতা থেকে নিয়েছেন। আর তাঁর বিখ্যাত 'নারীস্তোত্র' যে দেবেন্দ্রনাথের 'নারীমঙ্গল' প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই !

(২) মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ : ভবতোষ দত্ত ও আজাহার উদ্দীন খান সম্পাদিত।

(৩) নজরুল ও মোহিতলালের সম্পর্কের বিস্তারিত এবং কৌতূহলজনক ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য : "বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল" : আজাহারউদ্দীন খান।

(৪) কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

(৫) প্রবন্ধ সংকলন : বুদ্ধদেব বসু !

(৬) প্রবোধচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র ; "মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ" দ্রষ্টব্য।

বাংলার লোকমানসে গাছপালা, জীবজন্তু ও সংখ্যা

সমীরকুমার ঘোষ

বাংলার লোক-মানসে গাছপালা, জীবজন্তু ও সংখ্যা-র মধ্যে আর্য বা অনার্য যাই প্রভাব থাক না কেন, বলতে গেলে, এরা বাঙালী লোক-দৃষ্টির পরিচয় বহন করে, এরা বাংলার মাটিতে জাত, বাংলার জলবায়ুতে পরিপুষ্ট, বাঙালীর নিজস্ব লোকসম্পত্তি। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে, প্রকৃতিকে বুঝতে গিয়ে বাঙালী লোকমানস প্রকৃতিতে নিজ সত্তা আরোপ করে ; নিজ বিচার-বিশ্লেষণ, ধ্যান-ধারণার রূপ প্রকৃতির মধ্যে দেখতে চেয়েছে। তার ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে গাছপালা, ফল-মূল, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, কথাবার্তায়, গুণাগুণ বিচারে জীবন্ত হয়ে বাঙালী হয়ে উঠেছে। শুধু বয়স্কদের আলাপ-আলাপন দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, শুধু মেয়েলী পূজা-আর্চা ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে নয়, বাঙালী শিশুর জগতেও এরা ভয়-প্রীতি, আশ্বাস-আশ্রয় প্রদানকারী জীবন্ত বিশ্বাস ও সংস্কার।

গাছপালার দুনিয়া।—প্রাত্যহিক গতানুগতিক জীবনে আমরা নানা কথা ও কাজের মধ্যে গাছপালা ও ফল-পাকড়ের নাম নিয়ে থাকি, তাদের সম্বন্ধে এই ভাবে লোকদৃষ্টি গ'ড়ে ওঠে, কখনো বা তা স্থির প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়। সাধারণতঃ যে সব বিষয় আসে, তার মধ্যে অন্ন (ভাত), অশথ গাছ, আখ, আদা, আনারস, আম, আমড়া, উলুখাগড়া, এঁচড়, এলাচ, ওল, কচু, কথবেল, কদু, কলা, কাঁকুড়, কাঁচকলা, কাঁচলঙ্কা, কাঁঠাল, ফুলের কুঁড়ি, কুমড়ো, কুল, কুম্মাণ্ড, কেয়াবন; ক্ষুদ. (ক্ষেত), (খামার), খড়, খেজুরগাছ, গাব (গাবতলা), ঘাস, চন্দন, (কাঠ), চাঁপাফুল, চাল, চালতা, চালকুমড়া, চিঁড়ে, চৌদ্দশাক, ছোলা, (ছাতু), জাম, জামরুল, ঝাড়ের বাঁশ, ঝিঙে, ঝিঙেফুল, লাউ বা কুমড়ো) ডগা, ডাঁটা, ডাল, ডুমুর (ফুল/গাছ,) তরকারী, তরমুজ, তামাক, তাল, তিল, তুলো, তুলসী, তেঁতুল, থোড়, দুব্বো ঘাস (দুর্বাঘাস), ধনে-পলতা, ধান, ধানিলঙ্কা, নোটে শাক, নারকোল, নালতে শাক, নিম, নিমনিসিন্দা, নেবু (লেবু), পটোল, (তিত) পরেল, পলতা গাছ, পাট, পাটশাক, পাতা পান, পান-সুপুরি, পালঙ শাক, পুঁই, ফল, ফুটি, ফুল, বটগাছ (পাতা/ফুল), বন, বাকল (বাকলা), বাঁশ, বীচি (কাঁঠালের/ঘাসের/তেঁতুলের/কাঁকুড়ের), বীচে কলা, বীজ (বীজধান), বুনো ওল, বেগুন, বেল (বেলতলা, বেলপাতা), ভাত, ভেরেণ্ডা, মধু, ময়দা, মরিচ, মশুর (মশুরি), মাকাল ফল, (মানকচু/ মানপাতা), মাষকলাই, মুগের ডাল, মূল, (মূলা, মূলো,) রম্ভা (অষ্টরম্ভা), রসুন, রাই (সরষে/শাক), লঙ্কা, লতা, লাউ (চৈত্তের লাউ/ঝোলের লাউ), শাঁশ, শাক, শাল (গাছ/কাঠ), শাঁস (খোসা/ ছোবড়া), শিমুল (কাঠ/গাছ/ফুল), শেকড় (শিকড়), শেয়ালমূল/কাঁটা, শ্রীফল, সজনে (খাড়া/শাক), সরষে, সাঁচি পান, সুন্দরবন (সোঁদর বোন), সুঁদুরে পাট, হলুদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডাকের বচনে যেমন সামাজিক লোকসংস্কার ও বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে (যথা—অতিদীঘলী হয় রাঁড়ী, নির্ধন হয় নাড়ামুড়ী ॥ অন্ন অধিক নাহি দান, তা দাবড়িয়া না দিহ আন ॥ আনাহি বসন্ত, আনাহি চাষ, বলে ডাক—তার বিনাশ ॥) খনার বচনে প্রধানত কৃষিমাতৃক বাংলার চাষ আবাদের কথা প্রকাশ পেয়েছে (যথা—আমে বান, তেঁতুলে ধান ॥ দূর সভা, নিকট জল। নিকট সভা রসাতল ॥ বাঙ ডাকে

ঘনঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো ॥ পাঁচ রবি মাসে পায়। ঝরায় কিংবা খরায় যায় ॥ থেকে বলদ না বয় হাল, তার দুঃখ সর্বকাল ॥ গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে ॥ আউশ ধানের চাষ। লাগে তিন মাস ॥ কোদালে মান, তিলে হাল। কাতরে ফাকার, মাঘে কাল ॥ খনা ডেকে বলে যান, রোদে ধান, ছায়ায় পান ॥ লাউয়ের বল মাছের জল। ধেনো মাটিতে ঝাল প্রবল ॥ আখ আলু পুঁই, এ তিন চৈতে রুই ॥ ডাক দিয়ে বলে রাবণ। কলা লাগাবে আষাঢ়-শ্রাবণ ॥ বাঁশের নাতি, কলার পো। বছর বছর তুলে রো' ॥ ইত্যাদি)।

বাংলার লোকসংস্কার ও বিশ্বাসের আলোচনা ডাক ও খনার বচনের অন্তর্গত বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করি। বট, বেল, অশথ গাছ বাঙালীর লোকচিতে ভয়-ভীতি আশ্চর্যতা-আশ্বাসের সঞ্চার করে। বটগাছের তলায় দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। গ্রামে অশথ-বটগাছের ডালে মেয়েরা পুত্র-কামনায় বা কোন মনোরথ পূর্ণ হবার বাসনায় নুড়ি বাঁধে। কোন শক্তিমান লোকের আশ্রয়ে থাকার মানে বটবৃক্ষের ছায়ায় থাকা। সেঁজুতি ব্রতের ছড়ায় বর্ষীয়সী নারীমনের সংস্কার প্রকাশ পেয়ে বলেছে :

অশথ তলায় বসত করি।
সতীন কেটে আলতা পরি ॥

অথচ অশথ গাছে যত ভূত-প্রেতিনী, ইন্দ্রজালের আড্ডা। তা শ্মশানের কাছ হলে ত কথাই নেই। পেয়ারা গাছের তলায় ও পুঁই মাচায় প্রেতেরা আশ্রয় নেয় ; সন্ধ্যের পর ভুলেও ওপথ মাড়াতে নেই। শেওড়া গাছে পেত্নীরা থাকে, তারা কুৎসিত দেখতে। তাই কুশ্রী মেয়েকে বলা হয় শেওড়া গাছের পেত্নী। বেলগাছে থাকেন ব্রহ্মদত্যি—তিনি জাতে বামুন, খড়ম পায়ে চলেন, সহসা কারুর ক্ষতি করেন না। বেলপাতা পূজোয় অনিবার্য। একমাত্র বেলকাঠের তৈরী বৃষ দিয়ে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করা যেতে পারে। বৈশাখ মাসে যে অর্শ্বত্থপাতা ব্রত করা হয় তা আসলে ইন্দ্রজাল দিয়ে বৃষ্টি এনে পৃথিবীর শস্যসম্পদ রক্ষা করার প্রবৃত্তি থেকে এসেছে। বাঙালী তিলকে তাল করে ; সর্ষের মধ্যে ভূত দেখতে পায়। আমাদের নারকোলের চোখ আছে, কিন্তু তাল কানা, তাই তালগাছের তলা দিয়ে যেতে নেই। আমরা জানি আম ও আমড়ার স্বাদের মধ্যে অনেক তফাত। নিমগাছের হাওয়া স্বাস্থ্যকর, এমন কি এ হাওয়ায় মারীরোগ বসন্ত (মায়ের দয়া)-ও দূর হয়ে যেতে পারে। নিষ্কর্মার ধাড়ী ছেলে হচ্ছে 'অকাল কুম্মাণ্ড" কর্ম-উদ্যমহীন স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হচ্ছে "কুমড়ো কাটা বটঠাকুর" বাইরে থেকে দেখতে সুশ্রী অথচ কাজে নয় এমন ছেলে হচ্ছে "মাকাল ফল"। আমাদের গতানুগতিক বৈচিত্র্যহীন জীবন হচ্ছে 'থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়ের জীবন। খাদ্যরসিক বাঙালী খাদ্যে বৈচিত্র্যবিলাসী বৈচিত্র্যসন্ধানী তা এথেকে প্রমাণ হচ্ছে। অতি বেঁটে লোককে 'বেগুনগাছে আঁকশী' দিতে হয়। কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। আর কোন গুণ নাই যার তার নাম বেগুন ॥ রাগে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠার কথা মেয়েদের কাছ থেকে রান্নাঘরের অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। বাঙালীর চোখে হলুদ পবিত্র, বাঙালীর বিয়েতে গায়-হলুদ এক বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান। বাঙালী জানে : হলুদ জব্দ শিলে বউ জব্দ কিলে। পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে ॥ ব্যাঙের মামার সোনার ছাতি শোভা নাহি পায়। হলুদ খেলে রাঙা ছেলে কখনো না হয় ॥ এসব সংস্কার ও বিশ্বাস অনেক সময়

স্থির প্রত্যয়ে পরিণত হয়—গূঢ় অর্থের দ্যোতনা আনে। অষ্ট্রীক ভাষাভাষী জাতির কাছ থেকে আমরা পান-সুপুরি খাওয়ার প্রথা নিয়েছি ; ও দু'টোই শুভকর্মের উপাদান। পানের বরজে পবিত্র চিত্তে যেতে হয়। পরস্পরের মধ্যে শত্রুর সম্পর্ক হচ্ছে অহি-নকুলের বা আদায়-কাঁচকলার সম্পর্ক। আর আদার ব্যাপারী কি ক'রে জাহাজের খবর রাখে বলুন ?

বাঙালীর চোখে জীবজন্তুর বিষয় নিয়ে বিরাট গ্রন্থ লেখা যায়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর আধেয় বিশ্লেষণে বাঙালী জাতীয় চরিত্রের কয়েকটি দিক ধরা পড়বে বলে আমার ধারণা। একটা কথা আমার এ প্রসঙ্গে মনে হয়েছে যে দূরের ও বৃহদাকার জন্তুকে বাঙালী সম্ভ্রম, ভীতি ও মর্যাদার সঙ্গে দেখেছে, আর কাছের, অপরিচিত, ক্ষুদ্রাকার জীবজন্তু বাঙালীর কাছে অবজ্ঞা পেয়েছে, নানা দোষ ও অগুণের দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অতি পরিচিত বা অতি সান্নিধ্য থেকে জন্ম দেয় ঘৃণা। বাঙালীর গালিগালাজের কয়েকটা শব্দ হচ্ছে—গরু, বলদ, গাধা, ভেড়া, মেড়া, ছাগল, পাঁঠা (রাম), শূয়র আর কুকুর তো বটেই, কুত্তাকা বাচ্ছাও। এদের কাছে তার দৈনন্দিন পথযাত্রায় বাঙালী কত যে ঋণী, তা বলতে গেলে বাঙালী চরিত্রের অকৃতজ্ঞতার দিকটি জ্বলজ্বল করে ওঠে। আমাদের কথা-বার্তায় আলাপ-আলাপনে, সংস্কার ও বিশ্বাসের গড়নে যে সব জীবজন্তু, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির স্থান আছে তার মোটামুটি একটা তালিকা দিচ্ছি। অজগর, আরশুলা, ইচা মাছ, ইটা মাছ, ইঁদুর, ইলিশ মাছ, উকুন, উট, উদবেরাল, এড়ে (গরু/বাছুর), কই মাছ, কচি পাঁঠা, কচ্ছপ, কবুতর, কলুর বলদ, কাক, কাঁকড়া, কাঁকড়া বিছে, কাঁচপোকা, তেলাপোকা, কাছিম, কাজীর গরু, কাঠবিড়ালী, কাতলা মাছ, কাল সাপ (সাপিণী), কালীঘাটের কুকুর, কুকুরী, কুচ মাছ, কুঠে পাঁঠা, কুড়ে গরু, (কুত্তা/কুত্তী), কুনো ব্যাঙ, কুমীর, কেউটে সাপ, কেঁচো, কেঁটি কুকুর, কোকিল, কোলা ব্যাঙ, খটাশ, খরগোস, খরিশ সাপ, খাসী, খেঁকশিয়ালী, গজ, গজকচ্ছপ, গজাল মাছ, গরু (গাই), গাধা, গিরগিটি, গুইসাপ, গুটিপোকা, গুবরেপোকা, গেঁড়ি (গুগলী), গোখরো সাপ, ঘায়ের পোকা, ঘুঘু, ঘোড়া, চটক (পাখী), চড়ুই, চাতক, চামচিকে, চিল, ছাগ, ছাগল, ছাতারে পাখী, ছারপোকা, ছুঁচো, টিকটিকি, টিটির পাখী, টিয়ে (টিয়া), তিতপুঁটি, তুর্কী ঘোড়া, তোতা পাখী, দাঁড়কাক, দামড়া গরু, (বাছুর), দুধে গরু, ধোপার কুকুর, নেড়ী (নেলী) কুত্তা, পাঁকাল মাছ, পাখী, পাঁঠা (পাঁঠী), পায়রা, পিপড়ে, পুঁটি মাছ, পেঁচা, পোকা, পোনামাছ, ফড়িং, ফিঙে, ফেউ, বক, বকনা গুরু, বনমুরগী, বলদ, বাঘ (বাঘিনী) বাচা মাছ, বাছুর, বাঁদর, বাদুড়, বাবুই পাখী, বিছা, বিড়াল (বেড়াল), বিলের গরু, বেঙ (ব্যাঙ), বেঁজি, বেঁড়ে গরু (বলদ/বিল), বেদে সাপ, বোলতা, ভাল্লুক, ভীমরুল, ভেক, ভেটকি মাছ, ভেড়া, ভোঁদর, ভ্রমর, মৌমাছি, ময়ুর, মশা, মহিষ (মোষ), মাকড়, মাকড়সা, মাগুর মাছ, মাছি, মেছো কুমীর, মেড়া, মেনি-বাঁদর (বিরাল), মেষ, মোরগ (মুরগি), মোষ (মহিষ), রাঘব বোয়াল, রাজহাঁস, রুই মাছ, লাঠি সাপ, শকুন (শকুনি), শঙ্খচিল, শাল মাছ, শালিক পাখী, শিঙি মাছ, শিয়াল, শুটকি মাছ, শূয়র, শোল মাছ, ষাঁড়, সাপ, সিংহ (সিংহী), হনুমান, হরিণ, হাতী, হাঁস, হুলো, হেলে সাপ।

বাঙলার লোকচিত্তে ভিড়-করা এই সব পশুপাখী, সরীসৃপ-কীটেরা একদিকে যেমন এসেছে তার ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, অপরদিকে নানা কারণে নানা জীবেরা

এসেছে তার চেতনায়, তার কল্পনা চিত্রিত-রঞ্জিত হয়ে বাস্তব সত্তা লাভ করেছে। বাঙালী তার নিজ চরিত্রের নিজ কল্পনায় এদের ওপর দোষগুণ আরোপ করে প্রায় এদের একরম আত্মীয় করে তুলেছে, আত্মমুক্তির সন্ধান করেছে। প্রসঙ্গত, আজকাল কি রকম হয় জানি না, আমাদের শৈশবে, বাঙালী শিশুর বর্ণপরিচয় হত জীবজন্তুর কল্পনাসাহায্যে লাভ করে—"অ'য়ে অজগর আসছে তেড়ে। আ'য়ে আমটি খাব পেড়ে। ইঁদুরছানা ভয়ে মরে। ঈগল পাখী পাছে ধরে"—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। আধুনিককালে, কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বককে (বলাকা), জীবনানন্দ চিলকে, বিমলচন্দ্র ঘোষ পায়রা ও প্রজাপতিকে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় মরা কাককে অমর করে রেখেছেন। কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (বিশেষ করে ছোট গল্পে), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালীর চোখে গাছপালা ও জীবজন্তুর জগৎকে প্রাণবান করে তুলেছেন।

"মরা হাতী লাখ টাকা", একথা কে না জানে। কিন্তু 'কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাকে পড়ে"। আর পাকে পড়লে হাতী ব্যাঙেও মারে লাথি। বাঘ বাংলার সবচেয়ে প্রিয় ও গৌরবের বস্তু। তাই বাংলার বীরপুরুষ আশুতোষ বাংলার বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার)। কিন্তু বাঘের ঘরে ঘেগের বাসা হয়। কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাঘা, বাঘার শত্রু সিঙ্গি, সিঙ্গির শত্রু শেয়াল, শেয়ালের শত্রু মহাকাল। কারুর নিস্তার পাবার জো নেই। বাঘের দেবতাকে নিয়ে এক সময় বাংলায় রায়মঙ্গল কাব্য রচনা হয়েছিল তা ভুললে চলবে না। বাংলার লোকচিত্তে কাকের একটা বড় স্থান রয়েছে। কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ত একথা নীলদর্পণে উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলায় কাক কয়েকটি সুন্দর যুগ্মশব্দও দান করেছে। কাক-নিদ্রা, কাকস্নান, কাক জ্যোৎস্না, কাকবন্ধ্যা, কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না। কিছুর আশায় আজকের দিনে অনেক বাঙালীকে 'তীর্থের কাকের মত' বসে থাকতে হয়। কিন্তু কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে কার আশা। বামন হয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা। কুকুর সম্বন্ধে—মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত জন্তুসাথী কুকুর সম্বন্ধে, পৃথিবীর বহু জাতি নির্দয় ও নিষ্করুণ। আশ্চর্য! 'কুকুরকে নাই দিলে সে মাথায় চড়ে।' 'কুকুর রাজা হলেও জুতা খায়'। কুকুরকে দিলেও পিঠে পায়েস। ছাড়ে না তবু গুয়ের আয়েস। স্বভাব যায় না মলে। কুকুর নির্লজ্জ! কুকুরের মার আড়াই প্রহর। আর কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডললেও সোজা হয় না। কাউকে সিংহীর বাচ্চা বললে, সে হয়ত গর্ব অনুভব করবে। কিন্তু কাউকে কুত্তীকা বাচ্চা বলে দেখুন, কি মজাটা হয়! কোন জিনিস কাউকে দিয়ে ফেরত নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়ে জন্মাতে হয়। এই প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ছে বাংলার লোকেরা অনেকদিন আগে জৈন সন্ন্যাসীদের তাড়াবার জন্য তু তু করে তাদের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। সব শেয়ালেরই এক রা। বাংলায় "শেয়ালের যুক্তি" বলে একটা কথা আছে। লালকুত্তা নাকি শেয়ালের ভাই। বঙ্কিমচন্দ্র বিড়াল প্রবন্ধ লিখে তার অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বেড়াল মা ষষ্ঠীর বাহন। তাকে লাথি মারতে নেই, মারলে সেই বাড়ীতে ছেলেপুলে থাকে না। বেড়ালের কান্না অশুভসূচক, তা শুনতে নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিড়াল-তপস্বী ও ভিজে বেড়ালের মত লোকের অভাব নেই। বেড়াল যে বাঘের মাসী হয়, তা কিন্তু বাঘ জানে না, জানে বাঙালী লোকচিত্ত। কিন্তু আশ্চর্য হলেও, বেড়ালের ভাগ্যেও কখনো কখনো শিকে ছেঁড়ে—এক্ষেত্রে বাঙালীর অলক্ষ্যে অজানিতে ঐন্দ্রজালিক বিধাতার

কথা স্বীকৃত হয়েছে বাঙালী ভয়ে ইঁদুরের গর্তের ভিতর লুকোতে চায়। বাঙালী শিশু নতুন ধারাল দাঁতের আশায় তার পড়ে-যাওয়া দাঁত ইঁদুরের গর্তে দিয়ে দেয়—আর একটি ইন্দ্রজালে বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত। বাঙালীর চোখে নিরীহ লোক গোবেচারা, বর্ণীভূত লোক ভেড়া বা মেড়া, বোকা লোক গাধা, (রাম) পাঁঠা, ছাগল ; ধূর্ত লোক শেয়াল বা কাক। বাঙালী বাঁদরামী সহ্য করতে চায় না। ডুমুরের ফুল, ঘোড়ার ডিম, সাপের পাঁচ পা কেউ দেখে নি, দেখতে পেলে মন্দ হত না? আগেই বলেছি, অবিবাহিত লোকের ধারে-কাছে প্রজাপতি এসে পড়লে তার আশু বিবাহের সম্ভাবনা প্রচুর। কথার মাঝে টিকটিকি টিক্ টিক্ করে উঠলে তা ঠিক হয়ে ওঠে। শত্রু লোকের কই মাছের জান, ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়লে তার নাম হয় ইলশে গুড়ি, ইলিশ ধরার মরশুম আসে। প্রতিপত্তিশালী লোক বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারেন, তিনি রাঘব-বোয়াল, চুনোপুটি নন। "বাঙালরা" কি সত্যিই চিংড়ি মাছের কাঙাল, "ঘটির" নয়? বাঙালী জানে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। অবশ্য অন্ন লক্ষ্মী, তাই বাঙালী বাড়ীতে ভাত নষ্ট করা অশুভ লক্ষণ। মাছ-খেকো বাঙালীর অন্তরের কামনা—আমার সন্তান যেন থাকে মাছে-ভাতে। হাতীঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। মশা অতি ক্ষুদ্র জীব, তাকে মারতে কামান দাগতে হয় না। শকুনির শাপে কি গরু মরে? ব্যাঙের আবার সর্দি, তার সম্বল তো একটা আধুলি মাত্র! আরশুলা আবার পাখী! "বকধার্মিক" মানুষকে এড়িয়ে চলবেন—আর যিনি শত্রুর কুকুর, নরমের বাঘ। ভুলবেন না সুখের পায়রা উড়ে চলে যায় সুখের সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্য সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। কিন্তু সাপ নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। যদি হেলে ধরতে না পারেন কেউটে ধরবেন কি ভাবে? যদি সাপের মুখে চুমো, আবার ব্যাঙের মুখে চুমো দিতে পারেন, বুঝবো আপনি ওস্তাদ লোক। পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরবার তরে। লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে গেলে আমরা দুঃখ পাই। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি পিঁপড়ের গর্ত থেকে চিনি টেনে বের করতে চান। শিশু ছোটবেলায় মায়ের কাছ থেকে শোনে—মাছের মুড়ো খেলে বুড়ো হয়, ন্যাজা খেলে রাজা হয়। দুধেতে পিঁপড়ে থাকলে তা ফেলে দিতে নেই। পিঁপড়ে খেলে সাতার শেখে। এইভাবে সমাজীকরণে নানা ধাপে বয়স্কদের কাছ থেকে, তাদের চোখ নিয়ে, প্রত্যয় নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে, শিশু তার গোষ্ঠীর সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে লালিতপালিত হয়, পরে তার অধিকারী হয়। বাঙালীর সংস্কার ও বিশ্বাসে জীবজন্তুর জগতের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গেলে একটা গ্রন্থ লেখা যায়। কিন্তু আপাততঃ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করার অভিপ্রায় নেই।

বাঙালী লোকমানসে সংখ্যা "তিন"—সংখ্যার জগত এক অনাবিষ্কৃত অর্ধ-আবিষ্কৃত আশ্চর্য ও আনন্দের জগৎ—রহস্য ও ইন্দ্রজালে ঘেরা। তথাকথিত সভ্য ও অসভ্য বহু জাতির জাতীয় মানসে প্রাত্যহিক পথযাত্রায় বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, আচার-আচরণে সংখ্যার ঐন্দ্রজালিক ভূমিকা বিস্ময়কর। Lewis carroll এর (The Hunting of the shark) একটা লাইন মনে পড়ছে, "What I tell you for three times is true" রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' (স্বপ্নমঙ্গল) কবিতায় হবুচন্দ্র রাজা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনটে বাঁদর তার শিয়রে বসে উকুন বাছছিল। আর তিনি একটু নড়লেই তার গালে চড় মারছিল। কোন বাঙালী শিশু তিনবেলা খাই খাই করলে, তার মা তাকে কি করেন? আপনার পাশের বাড়ীর কোন বিবাহিত বধূ যদি তেরাত্রিরের মধ্যে

বিধবা হয়। আপনি কি ভাবেন? যদি কোন ব্রাহ্মণ তিন সন্ধ্যে পূজা আহ্নিক করেন। তিনি নিশ্চয়ই ধার্মিক। ছোটবেলায় আপনাদের অনেকের মত আমিও সেই পরিচিত ছড়াটি শুনেছিলুম—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
আরেক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান॥

বড় হয়ে মনে প্রশ্ন জেগেছিল শিবঠাকুর কে? তাঁর তিন কন্যাই বা কেন? পরে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনায় জেনেছি যে, শিব বা শিবঠাকুর আসলে শিয়াল অর্থবাচক, কন্যারা সব শিয়ালী। কিন্তু তিন কন্যা কেন? বাঙালীর লোকমানসে "তিন"-এর অর্থ গভীর দ্যোতনাময়। বাংলায় শিশুদের ছড়ায় তাই তার তিন মামা—চাঁদ মামা, সূর্য মামা, শেয়াল মামা। মামা অবশ্য শিশুর আত্মীয়ের আত্মীয়, তাই সুবিধা পেলেই মামার বাড়ী চলে যেতে চায়।

বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতীক বা উল্লেখ হিসাবে "তিন"-এর ব্যবহার অনুরাগীরা জানেন। এই প্রবন্ধে যদিও আমরা মুখ্যত বাংলা প্রবাদ থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরব, নীচে অন্য দিক থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :—

(১) আকড়ুম্ বাগড়ুম্ ঘোড়াড়ুম সাজে। (ছড়া)

(২) গুরু হে, একটা কথা শুনেছিলাম ত্রিপিনীর ঘাটে।
মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে॥ (নাথগীতিকা)

(৩) যোগীপাল ভোগীপাল মহাপালের গীত।
শুনিতে সকল লোক হয় আনন্দিত॥ (চৈতন্য ভাগবত)

(৪) এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
কোথাকার এক অধম রাজা পানসী বান্ধলো ঘাটে
আমি কি কার!
এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে,
চুলের মুঠা ধইরা রাজা উঠায় নৌকার পরে রে।
আমি কি করি! (লৌকিক প্রেমগীত)

(৫) বাদুনে উঠিয়া বলে, 'আমি তিন বান্ধনে দড়,
সোনার কামিনী ধান বাহানে আমি করি জড়।' (ধান-ভানার গীত)

(৬) আমার বাড়ীতে যাইও রে বন্ধু, বইতে দিয়াম পিড়া।
জলপান করিতে দিয়াম শালিধানের চিড়া॥
শালিধানের চিড়া দিয়াম আরও শরকীকলা।
ঘরে আছে মইষের দই রে, বন্ধু, খাইবা তিনো বেলা॥ (মহুয়া গীতিকা)

(৭) এক গাছে তিন তরকারী
দাঁড়িয়ে আছে লালবিহারী।—সজনে। (ধাঁধা

তিন তেরঙ্গা ধানের ভেঙ্গা,
গোটা মধুর পাত রাঙা।—পানিফল। (ধাঁধা)

(৮) আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেলা।
এক পাগলে রক্ষা নাই তিন পাগলের মেলা॥ (প্রবাদ)

(৯) অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ, তিনের রেখ না চিন। (প্রবাদ)

(১০) প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
যাহার লীলায় হৈল এ তিন ভুবন॥ (ধর্মপুরাণ)

বাংলা লোকসংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে আছে যে যাত্রে তিনবার কেউ না ডাকলে সাড়া দিতে নেই, নিশির ডাক হয়ে তা বিপথে নিতে পারে। সতীনের ডাক, নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ মেরে থাক। বাঙালী বংশকথা বলতে গিয়ে তিন পুরুষের কথা বলে। বাঙালীর কাছে বার বার মানে তিন বার সত্যি সত্যি তিন সত্যি করে তাকে শপথ নিতে হয়। তিনকাল গিয়ে তার বৃদ্ধ বয়েসে এককালে ঠেকে। বাঙালীর জীবনে তিনটি প্রধান ঘটনা—জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ। কারুর যদি রক্তসম্পর্কিত কোন আত্মীয় না থাকে আমরা বলি—'ওর তিনকালে কেউ নেই।' আমরা জানি কোন কথা যদি তিনজনে জানে তো ত্রিশজন জানে। তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার। কোন লোককে তিনটি জিনিষ দিলে সে নেয় না (তিন শত্রু দিতে নেই)। তিন বামুনে যেমন যাত্রা নেই, তিন শুদ্দুর বনে না। তিন মঙ্গলে বৃহস্পতি; কিন্তু তিন মাইয়া যেখানে কাজীর দরবার সেখানে। দোকানে জামা কাপড় কিনতে গিয়ে আমরা জানি তিনটে আকার ছোট-বড়-মাঝারি। আজো কি বাঙালী মেয়ের রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় বস্তু—তেল-নুন-লাকড়ি? বাসন-পত্র বলতে বোঝায়—থালা-বাটি-ঘটি? খাদ্যের স্বাদ বলতে বোঝায়—ঝাল-মিষ্টি-তেতো বা ঝাল-মিষ্টি-টক। নিরামিষ খাদ্যকে কি ভাবে ভাগ করা হবে বলতে পারি না তবে আমিষ বলতে বোঝায়—মাছ-মাংস ডিম। বাঙালী মেয়ের গয়না প্রধানত তিনটি—হাতের গয়না (চুড়ি; বালা; প্রভৃতি)। গলার হার ও কানের গয়না (দুল, ঝুমকো; প্রভৃতি)। বাঙালী সধবা নারীর বাহ্যিক লক্ষণ হচ্ছে; শাখা-সিদুর-নোয়া। ছেলেদের চাই জামা-কাপড়-জুতো; আর মেয়েদের শাড়ী-শায়া-ব্লাউজ। সবলোক কোন জায়গায় গেছে মানে সেখানে ছিল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। গোপাল হালদার মহাশয় বলছিলেন যে; নোয়াখালি অঞ্চলে মুসলমানেরা সাপ দেখলে তিনবার 'আল্লা' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ব্যবহারিক জীবন ও চাষ-আবাদ সংক্রান্ত উক্তিতে ও ডাকের বচনে তিন সম্পর্কে নানা উপদেশ ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন, তিন নাড়ায় সুপারি সোনা, তিন নাড়ায় নারকেল টেনা। তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল, তিন নাড়ায় গৃহস্থ গেল।

ডাক : মরণ, ধরণ, পানি।
বরাহ বলে তিনি নাহি জানি॥
বামুন, বাদল, বান।
দক্ষিণা পেলেই যান॥
শনির সাত, মঙ্গলের তিন।
আর সব দিনে দিন॥
আউশ ধানের চাষ।
লাগে তিন মাস॥
এক আঘনে ধান।
তিন শাওনে পান॥

আখ, আদা, পুই।
এ তিন চৈতে রুই ॥
এক পুকুরে রোপে তাল, পর পুকুরে করে পাল।
অপর পুকুরে ভুঞ্জে তাল ॥
(অর্থাৎ তিন পুকুরে ফল পাবে)

এ ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে তিনের জয়যাত্রা দেখতে পাই,—কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। সামাজিক ইতিহাস; আঞ্চলিক রসিকতা; স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অনেক উক্তির মধ্যে তিনের উল্লেখ আছে :—

পোস্ত, টক, কলাইয়ের ডাল,
এই তিন বীরভূমের চাল ॥
চোর, চোট্টা, হারামজাদ,
এই তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥
চিঁড়ে, চেটাই, শ্বেতলা,
তিন নিয়ে চেতলা ॥
তাঁতী, গোঁসাই, পচা ডুর,
এই তিন নিয়ে শান্তিপুর ॥
শান্তিপুর রসের সাগর,
এক এক ঘরে তিন তিন নাগর ॥
গাঁজা, গুলি, অন্নভাঙা,
তিন নিয়ে ফরাসডাঙা ॥
মোগল, মিশি, মাথাঘসা,
তিন দেখতে হুগলী আসা ॥
কাঙাল, বাঙাল খচ্চে,
তিননিয়ে নচ্চে ॥
বাঁশ, বাকস, ডোবা,
তিন নদের শোভা ॥
ধান, খুন, খাল,
তিন নিয়ে বরিশাল ॥
বেহায়া, বেরসিক, বাঁকা,
তিন নিয়ে ঢাকা ॥
চাল, চিঁড়ে, গুড়,
তিন নিয়ে দিনাজপুর ॥

তিন নাড়ায় গো।
দুয়ো দুয়ো, তিনে খাঁটি, আগে কাট কো ॥
(অর্থাৎ সুপারি গাছ তিনবার নেড়ে পুতবো)
বক, বকুল, চাঁপা।
তিন পুতো না বাপা ॥

কুঁজড়া, কাওয়ারী, নুর,
তিন নিয়ে মেদিনীপুর ॥
মোল্লা, মশা, শাঁখা
এই তিন নিয়ে ঢাকা ॥
আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান,
এই তিন নিয়ে বর্ধমান ॥
পোল, পাগল, হুলো,
তিন নিয়ে উলো ॥
কাগজ, কলম, কালি,
তিন নিয়ে বালি ॥
গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা,
তিন নিয়ে শরতনা ॥
গুলি, খিলি, মতিচুর,
তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর ॥
বাঁদর, সভাকর, মদের ঘড়া,
এই তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া ॥
রাস, তাস, জোরের লাঠি,
তিন নিয়ে পাণিহাটী ॥
রাঢ়, ষাঁড়, সন্ন্যাসী,
তিন নিয়ে বারাণসী ॥
রাঢ়, ষাঁড়, সিঁড়ি,
এ তিন কাশীর বৈরী ॥
কড়ি, মাটি, মিথ্যাকথা,
এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥

কয়েকটি পেশা ও জাতির সম্বন্ধে উক্তির মধ্যেও তিনের ছড়াছড়ি :—

চুর্ণ, চিন্তা, চালবাজি,
তিন নিয়ে কবিরাজী ॥
কথা, কড়া, কারসাজি,
তিন 'ক'-তে কবিরাজী ॥
বেজ, বালিয়া, বোড়া,
তিন নষ্টের গোড়া ॥
জল, জোলাপ, জোচ্চোরি,
এই তিন নিয়ে ডাক্তারি ॥
কায়েত, কালোসাপ, বেজো নারী,
তিন জনকে পরিহারী ॥

কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত॥
বামুন, বাসক, বাঁশ,
তিনে বাস্তুনাশ ॥
উড়ে, নেড়ে গলায় দড়ে,
কথা কইবে এ তিন ছেড়ে ॥
বামুন, বাদল, বান,
দক্ষিণা পেলেই যান ॥
বামুন, গরু, ছাগল,
তিনই দড়ির পাগল ॥

বাকি, বাক্য, বাটপাড়ি,
এই নিয়ে দোকানদারি ॥

আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে দেখি :—

জন, জামাই, ভাগিনা,
তিন নয় আপনা ॥

(তুলনীয় কবিকঙ্কণ : 'জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়')

রাজার যুবরাজ, মোহান্তের চেলা,
ফলনীর জামাই, এ নয় ভালা ॥

সাপ, শালা, জমিদার,
তিন নয় আপনার ॥

মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে উক্তিতে পাই :—

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী,
এ তিনে বিশ্বাস না করি ॥
তিন মাইয়া যেখানে,
কাজীর বিচার সেখানে ॥

নাও, ঘোড়া নারী,
যে চড়ে তারি ॥
গরু, জরু, ধান,
না দেখলেই যান ॥

জুয়া, যুবতী, ভাজা,
তিন বাদলের মজা ॥

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যে সব জনশ্রুতির জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে পাই :—

খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় তিনবার যায়।
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায় ॥
একবার যায় যোগী, দুবার যায় ভোগী
তিনবার যায় রোগী ॥
তাল, তেতুল, দই,
বৈদ্য বলে ওষুধ কই ॥

পুই, কচু, ঘেসো,
তিন আমাশার মেসো ॥
তেল, গুগগুল, ভেলা,
তিন বৈদ্যের জ্বালা ॥
শাক, অম্বল, পান্তা,
তিন ওষুধের হন্তা ॥

সমাজে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা অসম্মানজনক কাজের বা অশুভ পরিণতির যে তালিকা পাওয়া

যায় তার মধ্যে পাই :—

তাস, তামাক, পাশা,
এ তিন কর্মনাশা ॥
বাকি, বাক্য, বাটপাড়ি,
এ তিন নিয়ে দোকানদারি ॥
আহার, নিদ্রা, ভয়,
যত কর তত হয় ॥
চোর, ছিনাল, চোপায় দড়,
আগে যায় শীতলা মার ॥
টাক, প্রকৃতি, গোদ,
ম'লে হয় শোধ ॥
বামুন, বাকস, বাঁশ,
তিনে বাস্তনাশ ॥
তাল, তেঁতুল, মাজার,
তিনে দেখায় আঁধার ॥
ভাল, তেঁতুল, কুল,
তিনে বাত্ত নির্মূল ॥
ঘোল, কুল, কলা,
তিনে নষ্ট গলা ॥
ধরণ, মরণ, পানি,
তিন নাহিক জানি ॥
ওল, কচু, মান,
এ তিন সমান ॥

গুরু, গরু, আগুন,
পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ ॥
জন, জামাই, ভাগনা,
তিন নয় আপনা ॥
উই, ইঁদুর, কুজন,
ডাল ভাঙে তিনজন ॥
মন, মাতাল, দাঁতাল,
বেঁধে কর সামাল ॥
সাপ, শালা, জমিদার,
এ তিন নয় আপনার ॥
গরু, জরু, ধান,
না দেখলেই যান ॥
কাণা, খোঁড়া, কুব্জো,
তিন চলে না উজো ॥
কাণা, কুব্জো, খোঁড়া,
তিন অসত্তের গোড়া ॥
নদী, নারী, শস্ত্রধারী,
এ তিনে বিশ্বাস না করি ॥
গাঁজা, গেরুয়া, গোঁফদাড়ি,
এই তিনে সাধু ভারি ॥
জল, আগুন, মন,
বশে যতক্ষণ ॥

পেঁয়াজ, ধুম, নষ্টনারী,
চক্ষে আনে অশ্রুবারি ॥

কতকগুলি জিনিষের যথার্থ ও উপকারিতার উপদেশের মধ্যে পাই :—

কালি, কলম, মন,
লেখে তিনজন ॥
ছুচ, সোহাগা, সুজন,
ভাঙা; গড়ে, তিনজন ॥
জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে;
তিন বিধাতা নিয়ে ॥

জন্ম, মৃত্যু, বাণী,
তিন নাহিক জানি ॥
দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি,
এই তিন বড় উপকারি ॥
ডাক, ডুব, মুঠো,
আর সব ঝুটো ॥

উপরের উদ্ধৃতিগুলো এ কথা প্রমাণ করে যে, বাঙালীর লোকচিত্তে, বাংলার লোকসংস্কৃতি

ও বিশ্বাসে প্রতীক হিসাবে সংখ্যা 'তিন'-এর ভূমিকা বড় কম নয়। বাংলার ধর্ম-ব্যবস্থা আচার অনুষ্ঠান; লোকসাহিত্য; সংস্কার ও বিশ্বাসের নানাদিক থেকে আরো নজীর দেওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে তা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মনে হয় বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে; বাঙালীর লোকমানসে; বাঙালীর নির্জ্ঞানে মনে তিনের প্রভাব ও আধিপত্য যথেষ্ট। দুটি চরম প্রতিপাদ্যের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানা-পোড়ানো অন্য একটি প্রতিপাদ্যের প্রতিষ্ঠিতিতে বাঙালী চেতনা মুক্তি সন্ধান করে। কিন্তু তা সুষ্ঠুভাবে বলতে গেলে আরো চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন।

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

'প্রবন্ধপুস্তক'-এর বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে।'

এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎ প্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম।'

'বিবিধ প্রবন্ধের ১ম ভাগ ১৮৮৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এটি 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক-এর একত্রিত রূপ। এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'ইতিপূর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' নামে আর কতকগুলি 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য।

দুইখানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্বে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবর্তিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি রাখিতে হইয়াছে।

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১৮৯২খ্রীঃ 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রচার'র অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি এলোমেলোভাবে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধপ্রবন্ধ—২য় ভাগে সন্নিবেশিত করেন। বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন—'যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, অল্পভাগ প্রচারে।

১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকতা নির্বাহ করি। ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে—যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান লাভ করিয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে সে জন্য পত্র লেখেন, কিন্তু যাহা নাই তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে পুনর্মুদ্রিত করিব? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। আমার নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব না কি না, তাহা এক্ষণে

বলিতে পারি না।

যাহা পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত করা উচিত হইয়াছে কি না এ বিষয় বিচারের স্থল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' তাহার মধ্যে একটি। যে সকল কারণে এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা ঐ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। কিন্তু এখানে সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই। আমি সেখানে স্বীকার করিয়াছি যে, ঐ প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। ভ্রমগুলি সংশোধিত না করিয়া প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার একটি কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি কারণ নির্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান নাই। ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনি পুনর্মুদ্রিত করিতে চাই। যে মানুষ খ্যাতিলাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমরা দুই-ই দেখিতে ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল; অনেক পাঠক ঐ প্রবন্ধটিও দোষ গুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন।

এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অথও পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কর্তব্যবোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাঁহার কোন ত্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা উল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা যাঁহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাঁহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী সে দিন একটা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন ব্য প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া

কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্তা ত শুনিলাম না।

বলিতে কেবল বাকি আছে 'মনুষ্যত্ব কি?' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশমাত্র। ধর্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলধর্ম বুঝাইয়াছি তাহার বীজ ইহাতে আছে। রামধন পোদ ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল।'

সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধগুলিকে বিষয়ানুসারে ভাগ করে দেন। সেই ভাগটি এরূপ।—

সাহিত্য: উত্তরচরিত ২। গীতিকাব্য ৩। বিদ্যাপতি ও জয়দেব ৪। আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প ৫। শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা ৬। সঙ্গীত ৭। বাঙ্গালা ভাষা।

প্রত্নতত্ত্ব: ১। দ্রৌপদী ২। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ৩। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ৪। বাঙ্গালীর উৎপত্তি।

ইতিহাস ও অর্থনীতি: ১। বাঙ্গালীর বাহুবল ২। ভারত-কলঙ্ক ৩। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ৪। বঙ্গদেশের কৃষক ৫। বাঙ্গলা শাসনের কাল ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস ৭। বাঙ্গালার কলঙ্ক ৮। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৯। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ১০। রামধন পোদ।

দর্শন ও ধর্ম: ১। প্রকৃত এবং অতি প্রকৃত ২। ভালবাসার অত্যাচার ৩। জ্ঞান ৪। সাংখ্যদর্শন ৫। ধর্ম এবং সাহিত্য ৬। চিত্তশুদ্ধি ৭। গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি ৮। কাম ৯। ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে ১০। মনুষ্যত্ব কি?

বিবিধ: ১। অনুকরণ ২। প্রাচীনা ও নবীনা ৩। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ৪। বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা ৫। বহুবিবাহ ৬। বাহুবল ও বাক্যবল ৭। লোকশিক্ষা।

আমরা আর একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করলাম

	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল
১।	বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ, ১২৭৯
২।	ভারতকলঙ্ক	ঐ	ঐ
৩।	সঙ্গীত	ঐ	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯
৪।	উত্তরচরিত	ঐ	জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন, ১২৭৯
৫।	বঙ্গদেশের কৃষক	ঐ	ভাদ্র, কার্তিক, ফাল্গুন, পৌষ, ১২৭৯
৬।	সাংখ্যদর্শন	ঐ	পৌষ—ফাল্গুন ১২৭৯ এবং বৈশাখ ও আষাঢ় ১২৮০
৭।	গীতিকাব্য	ঐ	বৈশাখ, ১২৮০
৮।	প্রকৃত ও অতি প্রকৃত	ঐ	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০

৯।	বহুবিবাহ	বঙ্গদর্শন	আষাঢ়, ১২৮০
১০।	ভারতের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা	ঐ	ভাদ্র, ১২৮০
১১।	বঙ্গে ব্রহ্মণাধিকার	ঐ	ভাদ্র, ১২৮০
১২।	প্রাচীন ভারতের রাজনীতি	ঐ	আশ্বিন, ১২৮০
১৩।	বিদ্যাপতি ও জয়দেব	ঐ	পৌষ, ১২৮০
১৪।	প্রাচীনা ও নবীনা	ঐ	বৈশাখ ও আষাঢ়, ১২৮১
১৫।	বাঙ্গলা শাসনের কাল	ঐ	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১
১৬।	বাঙ্গালীর বাহুবল	ঐ	শ্রাবণ, ১২৮১
১৭।	আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প	ঐ	ভাদ্র, ১২৮১
১৮।	ভালবাসার অত্যাচার	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১২৮১
১৯।	অনুকরণ	ঐ	পৌষ, ১২৮১
২০।	বাঙ্গলার ইতিহাস	ঐ	মাঘ, ১২৮১
২১।	শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা	ঐ	বৈশাখ, ১২৮২
২২।	ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে	ঐ	বৈশাখ, ১২৮২
২৩।	দ্রৌপদী	ঐ	ভাদ্র, ১২৮২
২৪।	বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার—২য় প্রস্তাব	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১২৮২
২৫।	বাহুবল ও বাক্যবল	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র, ১২৮৪
২৬।	মনুষ্যত্ব কি?	ঐ	আশ্বিন, ১২৮৪
২৭।	বাঙ্গালা ভাষা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫
২৮।	লোকশিক্ষা	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১২৮৫
২৯।	বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১২৮৭
৩০।	বাঙ্গালীর উৎপত্তি	ঐ	পৌষ, ১২৮৭ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৩১।	রামধন পোদ	ঐ	ভাদ্র, ১২৮৮
৩২।	বাঙ্গলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ	ঐ	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯
৩৩।	বাঙ্গলার কলঙ্ক	প্রচার	শ্রাবণ, ১২৯১
৩৪।	ধর্ম এবং সাহিত্য	ঐ	পৌষ, ১২৯১
৩৫।	গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ১ম অংশ	ঐ	পৌষ, ১২৯১
৩৬।	বাঙ্গলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন	ঐ	মাঘ, ১২৯১
৩৭।	চিত্তশুদ্ধি	ঐ	ফাল্গুন, ১২৯১
৩৮।	গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষায় ঝুলি ২য় ও ৩য়	ঐ	বৈশাখ ও আষাঢ় ১২৯২
৩৯।	কাম	ঐ	আষাঢ়, ১২৯২
৪০।	জ্ঞান	ঐ	কার্তিক, ১২৯৩

উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—কল্যাণী প্রকাশন, ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১। মূল্য ছয় টাকা।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের "উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত" গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কান্দী ও বর্দ্ধমানের কাটোয়া মহকুমার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে লেখক তাঁর আগ্রহ, পরিশ্রম, জ্ঞান ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থটিতে। সাম্প্রতিককালে রাজনীতির দিক দিয়ে লোকজীবন যতটা উত্তোলিত, সংস্কৃতিগত আলোচনার দিক দিয়ে ততটা নয়। কারণ এর জন্যে যে আগ্রহ, দীর্ঘ পরিশ্রম ও জ্ঞানার্জন স্পৃহার প্রয়োজন তার নিতান্ত অভাব। এই দিক থেকে লেখক নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ এবং প্রশংসারযোগ্য। তাছাড়া যে অঞ্চলটিকে তিনি বেছে নিয়েছেন তার লোক-সংস্কৃতিগত পূর্ণ পরিচয় একত্রে এক গ্রন্থে দেবার প্রচেষ্টা এযাবৎ চোখে পড়েনি, সেদিক থেকে তাঁকে পথিকৃৎ বলা চলে। সাধারণ মানুষ এবং গবেষকদের গ্রন্থটি উৎসাহিত এবং আগ্রহী করে তুলতে পারে। শুধু লোকসঙ্গীত নিয়ে যেমন গবেষণা চলতে পারে তেমনি গ্রন্থে বিধৃত অঞ্চলের উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তর সম্পর্কেও গবেষণার সুযোগ কিছু পরিমাণে গ্রন্থকার দিতে পেরেছেন বলে মনে হয়। অবশ্য এই জাতীয় গ্রন্থরচনার বিপদ আছে। চলিষ্ণু জীবনধারার সঙ্গে যার উদ্ভব, বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ তাকে সংজ্ঞা ও আলোচনার নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলা অসুবিধাজনক, বিশেষ সেই বস্তুর আলোচনায় যার কোনো লিখিত রূপ নেই—সন, তারিখ, দেশ চিহ্নিত কোনো কাগজপত্র নেই। এরকম ক্ষেত্রে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে কখনই পৌছান যায় না। তাই মনে হয়, যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা মুখে মুখে ভৌগোলিক বেড়া টপকে প্রসারিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার সম্পর্কে রায় দেওয়া অপেক্ষা তার বর্ণনা, সম্ভাব্য প্রভাব প্রতিফলন ও সাদৃশ্য কথন অনেক বেশী নিরাপদ। আগ্রহের আন্তরিকতা, তারুণ্যের সাহসিকতা ও অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতার কারণে লেখক সর্বত্র সেই সাবধানী নিরাপত্তাবোধের আশ্রয় নেননি। এই কারণে গ্রন্থটি সম্পর্কে এখানে ওখানে প্রকাশিত দুটি একটি আলোচনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সে বিতর্কের মূল প্রশ্ন এই যে গ্রন্থটিতে সংগৃহীত এবং আলোচিত সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গীতই লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত কিনা? বিশেষ করে বাউল এবং কীর্তন? এই প্রশ্নের মীমাংসা লোকসঙ্গীতের স্বরূপ-বিশ্লেষণ-নির্ভর। আগেই বলা হয়েছে যে যা অবিরত পরিবর্তনশীল তাকে সংজ্ঞা এবং আলোচনার নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলা অসুবিধাজনক তবু আলোচনার সুবিধার্থে সমালোচকেরা এ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। সেই প্রচেষ্টার অনুসরণ করে বলা যায় যে লোকসাহিত্য বা লোকসঙ্গীতের একটি সামান্য লক্ষণ আছে। কবি ইয়েটস্-এর মধ্যে তাঁর দেশজ দীর্ঘকাল বহমান কাব্যধারা পুনর্ণবজাত হয়েছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর সংজ্ঞা না দিয়ে বর্ণনার সাহায্যে লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছিলেন, "it has gathered into itself, the simplest and most

unforgettable thoughts of the generations, where all great arts are rooted"—"By the Roadside"—W. B. Yeats. বোঝা কষ্টকর নয় যে লোকসাহিত্য সমগ্র জাতীয় যৌথ জীবনের প্রাণবীজ থেকে—ব্যক্তি বিশেষের করক্ষেপ দ্বারা অপীড়িত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ফসলের মত উন্মীলিত হয়। কোন শাস্ত্র, পুরাণ বা প্রাকনির্ণীত দার্শনিক জীবনবোধ বা অধ্যাত্ম এষণা লোক-সঙ্গীতের পশ্চাৎভূমি রচনা করেনি, যুগসঞ্চিত লোকভূমিই এর একমাত্র অবলম্বন। উর্দ্ধকোটি অভিজাত অংশ বিশেষের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে এ রচিত হয় না, লোকসমাজের নিজেদের কথা এর অবলম্বন বলে এ অনতিপরিশ্রুত, অমসৃণ অথচ জীবনরসসম্পৃক্ত লৌকিক বস্তুভিত্তিক। তাই লোক-সাহিত্য কোনো বিশেষ কবি নামাঙ্কিত নয়, লোককথাশিল্পী সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Myth and Epic merged into one; the people having created its epic character endowed with all the vigour of its own collective soul"—The Destruction of Personality"—Literature and Life (selections from the writings of M. Gorky) এই সমস্ত কারণে কোনো বিশেষ বস্তু লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত কিনা তার বিচার করতে হলে ভাববস্ক, রূপকল্প ও বাক্‌রীতি এই ত্রিকোণ বিলম্বিত দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ ভাববস্কে যুগসঞ্চিত লোক মনোভূমি আছে কিনা, রূপকল্পটি বহুকাল ধরে লোকসমাজে গৃহীত হয়ে তাদের আনন্দ দিয়ে আসছে কিনা এবং বাকরীতি দেশের প্রাণময় প্রান্তর থেকে বিকশিত কিনা সে বিচার করতে হবে। এই ত্রিকোণ বিলম্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে যদি কোনো সঙ্গীত বা সাহিত্য উত্তীর্ণ হয় তবে তা লোকসঙ্গীতের বা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত হবে তা সে কীর্তনই হোক বা বাউলই হোক। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা যেতে পারে যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিপরিচয়হীন স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য এবং ব্যক্তিপরিচয়যুক্ত সাহিত্যিক মহাকাব্য স্বীকৃতি পেয়েছে তেমনি লোকসাহিত্যের মৌল লক্ষণ বিকৃত না হয়ে যদি কোনো ব্যক্তিপরিচয়যুক্ত রচনার আত্মপ্রকাশ করে তবে তাকেও লোকসাহিত্যের স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। এইদিক থেকে দিলীপবাবু বিভ্রান্তির পরিচয় দেননি।

বক্ষমান গ্রন্থে উত্তররাঢ়ের লোকসঙ্গীতের উৎসমূল নির্ণয়ে সমাজতাত্ত্রিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। ভূমি ও শস্য বণ্টনের বৈষম্য, বেঁচে থাকার জৈব প্রবৃত্তি—সন্তান ও শস্যকামনা, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে ও যাদুতে বিশ্বাস প্রভৃতি এই বিশ্লেষণের প্রধান অঙ্গ গঠন করেছে। ওছাড়া এই অঞ্চলের লোকজীবনের প্রধান প্রধান ধর্মবিশ্বাস, বাঙ্গালীর কৌমজীবনের ধারার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সম্পর্ক নির্ণয়, লোকসঙ্গীতের প্রকৃতিগতবৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনায় অঙ্গীভূত হয়েছে। অতঃপর লেখক সংগ্রাহক ও দৃষ্টান্ত বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করেছেন। সংগ্রহের মধ্যে এসেছে, পটুয়া, বেদে, ছাদপেটানো, ভাঁজো, বোলান, পোড়ো, ডাক, সাঁওতালী, পালাবন্দী, করমপূজা; ভাদু, ঘেঁটু, সহরাই (বাঁধনা), মনসাপূজা, বিয়ে, সাঁওতাল বিয়ে, আলকাপ, ঝুমুর, লেটো, রায়বেঁশে, কৃষক, বিজয়া, হাপু, বারমেসে, বাউল, ফকির, কীর্তন, চৌপহল্লা, মনসামঙ্গল, ভাঁজুই, ভাসান, ছড়া, বৈষ্ণব, কবি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের গান। তালিকা থেকেই বিষয়ের ব্যাপকতা সহজেই অনুমেয়, সে তুলনায় গ্রন্থের পরিসর নিতান্ত স্বল্প। তাই

উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—কল্যাণী প্রকাশন, ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১। মূল্য ছয় টাকা।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের "উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত" গ্রন্থটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কান্দী ও বর্দ্ধমানের কাটোয়া মহকুমার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে লেখক তাঁর আগ্রহ, পরিশ্রম, জ্ঞান ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থটিতে। সাম্প্রতিককালে রাজনীতির দিক দিয়ে লোকজীবন যতটা উত্তোলিত, সংস্কৃতিগত আলোচনার দিক দিয়ে ততটা নয়। কারণ এর জন্যে যে আগ্রহ, দীর্ঘ পরিশ্রম ও জ্ঞানার্জন স্পৃহার প্রয়োজন তার নিতান্ত অভাব। এই দিক থেকে লেখক নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ এবং প্রশংসারযোগ্য। তাছাড়া যে অঞ্চলটিকে তিনি বেছে নিয়েছেন তার লোক-সংস্কৃতিগত পূর্ণ পরিচয় একত্রে এক গ্রন্থে দেবার প্রচেষ্টা এযাবৎ চোখে পড়েনি, সেদিক থেকে তাঁকে পথিকৃৎ বলা চলে। সাধারণ মানুষ এবং গবেষকদের গ্রন্থটি উৎসাহিত এবং আগ্রহী করে তুলতে পারে। শুধু লোকসঙ্গীত নিয়ে যেমন গবেষণা চলতে পারে তেমনি গ্রন্থে বিধৃত অঞ্চলের উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তর সম্পর্কেও গবেষণার সুযোগ কিছু পরিমাণে গ্রন্থকার দিতে পেরেছেন বলে মনে হয়। অবশ্য এই জাতীয় গ্রন্থরচনার বিপদ আছে। চলিষ্ণু জীবনধারার সঙ্গে যার উদ্ভব, বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ তাকে সংজ্ঞা ও আলোচনার নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলা অসুবিধাজনক, বিশেষ সেই বস্তুর আলোচনায় যার কোনো লিখিত রূপ নেই—সন, তারিখ, দেশ চিহ্নিত কোনো কাগজপত্র নেই। এরকম ক্ষেত্রে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে কখনই পৌঁছান যায় না। তাই মনে হয়, যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা মুখে মুখে ভৌগোলিক বেড়া টপকে প্রসারিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার সম্পর্কে রায় দেওয়া অপেক্ষা তার বর্ণনা, সম্ভাব্য প্রভাব প্রতিফলন ও সাদৃশ্য কথন অনেক বেশী নিরাপদ। আগ্রহের আন্তরিকতা, তারুণ্যের সাহসিকতা ও অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতার কারণে লেখক সর্বত্র সেই সাবধানী নিরাপত্তাবোধের আশ্রয় নেননি। এই কারণে গ্রন্থটি সম্পর্কে এখানে ওখানে প্রকাশিত দুটি একটি আলোচনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সে বিতর্কের মূল প্রশ্ন এই যে গ্রন্থটিতে সংগৃহীত এবং আলোচিত সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গীতই লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত কিনা? বিশেষ করে বাউল এবং কীর্তন? এই প্রশ্নের মীমাংসা লোকসঙ্গীতের স্বরূপ-বিশ্লেষণ-নির্ভর। আগেই বলা হয়েছে যে যা অবিরত পরিবর্তনশীল তাকে সংজ্ঞা এবং আলোচনার নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলা অসুবিধাজনক তবু আলোচনার সুবিধার্থে সমালোচকেরা এ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। সেই প্রচেষ্টার অনুসরণ করে বলা যায় যে লোকসাহিত্য বা লোকসঙ্গীতের একটি সামান্য লক্ষণ আছে। কবি ইয়েটস্-এর মধ্যে তাঁর দেশজ দীর্ঘকাল বহমান কাব্যধারা পুনর্বজাত হয়েছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর সংজ্ঞা না দিয়ে বর্ণনার সাহায্যে লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছিলেন, "it has gathered into itself, the simplest and most

unforgettable thoughts of the generations, where all great arts are rooted"—"By the Roadside"—W. B. Yeats. বোঝা কষ্টকর নয় যে লোকসাহিত্য সমগ্র জাতীয় যৌথ জীবনের প্রাণবীজ থেকে—ব্যক্তি বিশেষের করক্ষেপ দ্বারা অপীড়িত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ফসলের মত উন্মীলিত হয়। কোন শাস্ত্র, পুরাণ বা প্রাকনির্ণীত দার্শনিক জীবনবোধ বা অধ্যাত্ম এষণা লোক-সঙ্গীতের পশ্চাৎভূমি রচনা করেনি, যুগসঞ্চিত লোকভূমিই এর একমাত্র অবলম্বন। উচ্চকোটি অভিজাত অংশ বিশেষের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে এ রচিত হয় না, লোকসমাজের নিজেদের কথা এর অবলম্বন বলে এ অনতিপরিশ্রুত, অমসৃণ অথচ জীবনরসসম্পৃক্ত লৌকিক বস্তুভিত্তিক। তাই লোক-সাহিত্য কোনো বিশেষ কবি নামাঙ্কিত নয়, লোককথাশিল্পী সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Myth and Epic merged into one; the people having created its epic character endowed with all the vigour of its own collective soul"—The Destruction of Personality"—Literature and Life (selections from the writings of M. Gorky) এই সমস্ত কারণে কোনো বিশেষ বস্তু লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত কিনা তার বিচার করতে হলে ভাববদ্ধ, রূপকল্প ও বাক্‌রীতি এই ত্রিকোণ বিলম্বিত দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ ভাববদ্ধে যুগসঞ্চিত লোক মনোভূমি আছে কিনা, রূপকল্পটি বহুকাল ধরে লোকসমাজে গৃহীত হয়ে তাদের আনন্দ দিয়ে আসছে কিনা এবং বাকরীতি দেশের প্রাথমিক প্রান্তর থেকে বিকশিত কিনা সে বিচার করতে হবে। এই ত্রিকোণ বিলম্বিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে যদি কোনো সঙ্গীত বা সাহিত্য উত্তীর্ণ হয় তবে তা লোকসঙ্গীতের বা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত হবে তা সে কীর্তনই হোক বা বাউলই হোক। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা যেতে পারে যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিপরিচয়হীন স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য এবং ব্যক্তিপরিচয়যুক্ত সাহিত্যিক মহাকাব্য স্বীকৃতি পেয়েছে তেমনি লোকসাহিত্যের মৌল লক্ষণ বিকৃত না হয়ে যদি কোনো ব্যক্তিপরিচয়যুক্ত রচনার আত্মপ্রকাশ করে তবে তাকেও লোকসাহিত্যের স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। এইদিক থেকে দিলীপবাবু বিভ্রান্তির পরিচয় দেননি।

বর্দ্ধমান গ্রন্থে উত্তররাঢ়ের লোকসঙ্গীতের উৎসমূল নির্ণয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। ভূমি ও শস্য বণ্টনের বৈষম্য, বেঁচে থাকার জৈব প্রবৃত্তি—সন্তান ও শস্যকামনা, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে ও যাদুতে বিশ্বাস প্রভৃতি এই বিশ্লেষণের প্রধান অঙ্গ গঠন করেছে। ওছাড়া এই অঞ্চলের লোকজীবনের প্রধান প্রধান ধর্মবিশ্বাস, বাঙ্গালীর কৌমজীবনের ধারার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সম্পর্ক নির্ণয়, লোকসঙ্গীতের প্রকৃতিগতবৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনায় অঙ্গীভূত হয়েছে। অতঃপর লেখক সংগ্রাহক ও দ্রষ্টাস্থ বিশ্লেষকের ভূমিকা পালন করেছেন। সংগ্রহের মধ্যে এসেছে, পটুয়া, বেদে, ছাদপেটানো, ভাজো, বোলান, পোড়ো, ডাক, সাঁওতালী, পালাবন্দী, করমপূজা; ভাদু, ঘেঁটু, সহরাই (বাঁধনা), মনসাপূজা, বিয়ে, সাঁওতাল বিয়ে, আলকাপ, ঝুমুর, লেটো, রায়বেঁশে, কৃষক, বিজয়া, হাপু, বারমেসে, বাউল, ফকির, কীর্তন, চৌপহল্লা, মনসামঙ্গল, ভাঁজুই, ভাসান, ছড়া, বৈষ্ণব, কবি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের গান। তালিকা থেকেই বিষয়ের ব্যাপকতা সহজেই অনুমেয়, সে তুলনায় গ্রন্থের পরিসর নিতান্ত স্বল্প। তাই

আলোচনা এবং বিশ্লেষণে কিছু কিছু অভাব থাকা স্বাভাবিক এবং তা আছেও।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে সংগৃহীত গানগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এত কম যে তা নেই বললেই চলে। সাঁওতালী গানগুলির ব্যাখ্যায় আরো সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল, শিক্ষিত সাঁওতালদের কাছ থেকে প্রত্যেকটি সাঁওতালী শব্দের বাংলা অর্থ জেনে নেওয়া যেতে পারত। নানা গানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণে কথিত নানা কাহিনীর সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখানোর আরো অনেক সুযোগ ছিল। যাদুবিশ্বাস, সন্তান ও শস্যকামনা প্রসঙ্গে অথর্ব-বেদের কিছু কিছু বিষয় উদ্ধার করা যেতে পারত। সাওতালী গানে বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ করে শক্তি ও বৈষ্ণব প্রভাব কিছু কিছু পড়েছে বা পড়তে পারে কিনা সে আলোচনার সুযোগ ছিল, অনেক রায়বেঁশে ও অন্যান্য গানে প্রায় অবিকৃতভাবে শাক্তপদ পাওয়া যাচ্ছে অথচ সেদিকে লেখকের দৃষ্টি পড়েনি। আসলে যে কাজ অনেকে মিলে করা উচিত আমরা তা অনেকেই একা করি তাই বহু ব্যাপ্ত ও ব্যাপক বিষয়ের আনাচেকানাচে সর্বত্র আলোচনার সন্ধানী আলো পৌঁছায় না।

তবে একথা ঠিক যে তত্ত্বগত দিক এবং রায়বেঁশে, আলকাপ প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ এবং নানা আঞ্চলিক শব্দের অর্থসন্ধানের দিক থেকে দিলীপবাবুর সঙ্গে অনেকেরই মতভেদ হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও গ্রন্থটির মধ্যে লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত বহু ব্যক্তির অজ্ঞাত এক বিশেষ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির রূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে এমন বলা যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ পাঠক গ্রন্থটি পড়ে পরিচিতির নব আস্বাদন লাভ করবেন আর অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তিরা অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করবেন। ৺তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে তা অত্যন্ত স্পষ্ট, "সব মিলিয়ে লোকজীবনের যে বৃহৎ, ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন মূর্তিটি রচিত হয়েছে তাতে মনে হল যেন হারানো জীবনের অংশটাকে খুঁজে পেয়েছি এবং তার অনেক অজানা ও স্বল্পজানা অংশকে নতুন করে চিনতে পেরেছি।" তত্ত্বগত দিক থেকে সর্বত্র সার্থকতা থাক আর নাই থাক, রসগত দিক থেকে এ গ্রন্থ এক বৃহৎ জনপদের লোকসংস্কৃতির পরিচয়কে সঞ্চারিত করতে পেরেছে, সেখানেই লেখকের সব থেকে বড় পুরস্কার। ভবিষ্যতে লেখক গ্রন্থটিকে আরো সম্পূর্ণাঙ্গ করে তুলবেন আশা করি।

দ্বীপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়